وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

খণ্ড- 11 / সংখ্যা-46

সাপ্তাহিক

বদর

কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

বাৎসরিক সাব্‌সক্রিপশন ৬০০ টাকা

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

www.akhbarbadr.in

বৃহস্পতিবার 12 Nov, 2026 1 জামাদিউস সানি 1448 A.H

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

দরূদ শরীফ পাঠ করার আদেশ

وَاصۡبِرۡ نَفۡسَکَ مَعَ الَّذِیۡنَ یَدۡعُوۡنَ رَبَّہُمۡ بِالۡغَدٰوۃِ وَالۡعَشِیِّ یُرِیۡدُوۡنَ وَجۡہَہٗ وَلَا تَعۡدُ عَیۡنٰکَ عَنۡہُمۡ ۚ تُرِیۡدُ زِیۡنَۃَ الۡحَیٰوۃِ الدُّنۡیَا ۚ وَلَا تُطِعۡ مَنۡ اَغۡفَلۡنَا قَلۡبَہٗ عَنۡ ذِکۡرِنَا وَاتَّبَعَ ہَوٰىہُ وَکَانَ اَمۡرُہٗ فُرُطًا ○

অনুবাদ: এবং তুমি ধৈর্য সহকারে নিজেকে তাহাদের সহিত (সংযুক্ত) রাখ যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে তাঁহার সন্তোষ লাভের আশায় সকাল এবং সন্ধ্যায় ডাকে; এবং পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনায় তোমার চক্ষুদ্বয় যেন তাহাদিগকে পিছনে ফেলিয়া আগে বাড়িয়া না যায়, এবং তাহার আনুগত্য করিও না যাহার অন্তঃকরণকে আমরা আমাদের স্মরণ হইতে গাফেল করিয়া দিয়াছি এবং সে হীন বাসনার অনুসরণ করিয়াছে এবং যাহার বিষয় সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। [সূরা কাহাফ: আয়াত: ২৯]

মহানবী (সা.)-এর বাণী

মহান আল্লাহর স্মরণের মজলিসের ফযীলত



عَنۡ أَبِي هُرَيۡرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الۡخُدۡرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنۡهُمَا قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: لَا يَقۡعُدُ قَوۡمٌ يَذۡكُرُونَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتۡهُمُ الۡمَلَائِكَةُ، وَغَشِيَتۡهُمُ الرَّحۡمَةُ، وَنَزَلَتۡ عَلَيۡهِمُ السَّكِينَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيمَنۡ عِنۡدَهُ۔

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) এবং হজরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন:

"যখনই কোনো দল মহান আল্লাহ্‌র স্মরণ করার উদ্দেশে একত্রে বসে, তখন ফেরেশতারা তাদের চারদিক থেকে ঘিরে নেন, আল্লাহ্‌ রহমত তাদের আচ্ছাদিত করে ফেলে, তাদের ওপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয় এবং মহান আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী বান্দাদের মধ্যে তাদের আলোচনা করেন।"

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া ওয়াত তাওবাহ ওয়াল ইস্তিগফার, অধ্যায়: পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও আল্লাহ্‌ স্মরণের উদ্দেশে একত্র হওয়ার ফযীলত, হাদীস নং ২৭০০)

عَنۡ أَبِي هُرَيۡرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنۡهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلۡتَمِسُونَ أَهۡلَ الذِّكۡرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوۡمًا يَذۡكُرُونَ اللّٰهَ تَنَادَوۡا: هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمۡ، قَالَ: فَيَحُفُّونَهُمۡ بِأَجۡنِحَتِهِمۡ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنۡيَا.

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন: "মহান আল্লাহর কিছু ফেরেশতা পথে পথে ঘুরে বেড়ান এবং আল্লাহ্‌ স্মরণকারীদের সন্ধান করতে থাকেন। যখন তাঁরা এমন কোনো দলের সন্ধান পান, যারা মহান আল্লাহ্‌ স্মরণে রত রয়েছে, তখন তাঁরা একে অপরকে আহ্বান করে বলেন, 'এসো! তোমরা যে জিনিসের সন্ধান করছ, তা পেয়ে গেছ।' এরপর তাঁরা নিজেদের ডানা দিয়ে সেই লোকদের পৃথিবীর আকাশ পর্যন্ত ঘিরে রাখেন।" (সহীহুল বুখারী, কিতাবুদ দা'ওয়াত, অধ্যায়: মহান আল্লাহ্‌ স্মরণের ফযীলত, হাদীস নং ৬৪০৮)



হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

আত্মসংশোধন এবং তাকওয়া অর্জনের জন্য সাদিকদের সাহচর্যের গুরুত্ব

হযরত আকদাস মসীহে মওউদ (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) বলেন:

"আত্মসংশোধনের একটি পথ মহান আল্লাহ এভাবে নির্দেশ করেছেন: كُوۡنُوۡا مَعَ الصّٰدِقِيۡنَ (আত্-তাওবাহ: ১১৯)। অর্থাৎ, যারা কথা, কাজ, আচরণ ও নিজেদের সামগ্রিক অবস্থার দিক থেকে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাদের সঙ্গে থাকো।"

(অর্থাৎ, তাদের কথাবার্তাও সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে, তাদের কাজকর্মও সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তাদের প্রতিটি অবস্থা থেকেই সত্য প্রকাশ পাবে। অর্থাৎ, তারা হবে সৎ ও নেককার মানুষ।)

তিনি (আ.) বলেন, "এর পূর্বে বলা হয়েছে: يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ । অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, প্রথমে ঈমান থাকতে হবে। এরপর সুন্নত ও আদর্শ অনুসরণ করে মন্দের স্থান পরিত্যাগ করতে হবে এবং সত্যবাদীদের সাহচর্যে থাকতে হবে। সাহচর্যের অত্যন্ত গভীর প্রভাব রয়েছে, যা মানুষের অন্তরে ক্রমাগত সঞ্চারিত হতে থাকে।"

তিনি (আ.) আরও বলেন, "যদি কোনো ব্যক্তি প্রতিদিন পতিতাদের আস্তানায় যায় এবং এরপর বলে, আমি কি ব্যভিচার করি?"

(অর্থাৎ, আমি তো ব্যভিচার করার উদ্দেশে সেখানে যাই না।) "তাকে বলা উচিত, হ্যাঁ, তুমি একদিন না একদিন অবশ্যই তা করবে এবং কোনো এক সময় এতে লিপ্ত হয়ে পড়বে।"

(কারণ, অসৎ সাহচর্যের খারাপ প্রভাব রয়েছে।)

"কেননা, সাহচর্যের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা রয়েছে। একইভাবে, যে ব্যক্তি মদের দোকানে যায়, সে যতই সংযম অবলম্বন করুক না কেন এবং যতই বলুক যে, আমি মদ পান করি না, কিন্তু একদিন এমন আসবে, যখন সে অবশ্যই মদ পান করবে।"

(মালফুযাত, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২৪৭; ১৯৮৫ সালের সংস্করণ, ইংল্যান্ডে

তফসীরে কবীর

সময়ের সঠিক মূল্যায়ন, অপচয় রোধ অনর্থক মজলিস থেকে বিরত থাকা এবং ধর্মীয় উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গুরুত্বসহকারে আমল করা প্রয়োজন

হজরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন:

"আমাদের জামা'আতের কোনো একজন সদস্যেরও সময় নষ্ট হওয়া উচিত নয়। প্রত্যেক আহমদীর চেষ্টা করা উচিত, যেন তার সময় অনর্থক গল্পগুজব ও অর্থহীন কথাবার্তায় নষ্ট না হয়। আমাদের কথাবার্তা ধর্ম সম্পর্কিত হওয়া উচিত এবং আমাদের সময় ধর্মের প্রচার, শিক্ষা ও নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের কাজে ব্যয় হওয়া উচিত।

আমরা যদি আজ থেকেই এ প্রচেষ্টা শুরু করি, তাহলে ধীরে ধীরে সেই সময় আমাদের নিকটবর্তী হয়ে আসবে, যখন সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় আলোচনা এবং নিখাদ ধর্মীয় উদ্দেশ্য আমাদের সভা-সমাবেশগুলোতে প্রাধান্য লাভ করবে।

প্রত্যেক আহমদীর উচিত গুরুত্বের সঙ্গে নিজের কর্তব্য সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা। যে ব্যক্তি গুরুত্বের সঙ্গে চিন্তাভাবনা করবে এবং আহমদিয়াতের উদ্দেশ্যগুলো পূর্ণ করার চেষ্টা করবে, তার মস্তিষ্কে একপ্রকার জ্যোতি সৃষ্টি হবে এবং তার চিন্তাশক্তি আরও আলোকিত হবে।

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে মস্তিষ্ক তো প্রায় একই রকমই দান করা হয়। কিন্তু সেগুলোকে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর ফলে কিছু মানুষ চিন্তাবিদ ও দূরদর্শী হয়ে ওঠে এবং অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিল সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে, কিছু মানুষ নিজেদের মস্তিষ্ককে সঠিকভাবে কাজে না লাগানোর কারণে নির্বোধ ও মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে পড়ে এবং তাদের মস্তিষ্কে উচ্চমানের কোনো জ্যোতি সৃষ্টি হয় না।"

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড ২৭, পৃষ্ঠা ৪৭৩)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আ.)-এর যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা ২০২৬-এর দ্বিতীয় দিনের অপরাহ্ন অধিবেশনে ভাষণের সারসংক্ষেপ

মজলিশ আনসারুল্লাহ ভারত-এর প্রিয় সদস্যবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আলহামদুলিল্লাহ! মহান আল্লাহ আপনাদের বার্ষিক সম্মেলন আয়োজন করার তৌফিক দান করেছেন। আল্লাহ্তাআলা এই সম্মেলনকে সর্বতোভাবে সফল ও বরকতময় করুন। আমিন।

এই উপলক্ষ্যে আমি আপনাদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাঁই।

মজলিশ আনসারুল্লাহর সদস্যদের নিজেদের যথার্থ আত্মসমালোচনা করা উচিত যে, আমরা কি নিজেদের জীবনকে হজরত মসীহ্ মওউদ (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী গড়ে তোলার চেষ্টা করছি? আমরা যদি নিজেদের আত্মসমালোচনা করি, তাহলে দেখতে পাব যে, আনসারুল্লাহ নামে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের অবস্থা উদ্বেগজনক। অথচ তিনি (আ.) জামা'আতের প্রত্যেক সদস্যের কাছ থেকে উচ্চমানের জীবন প্রত্যাশা করেন। সেখানে আনসারুল্লাহ নামে পরিচিত হওয়ার পরও যদি আমরা এ বিষয়ে যথাযথ মনোযোগ না দিই, তাহলে তা কতই না দুর্ভাগ্যজনক!

আমাদের নিজেদের ঘরের পরিবেশ এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যেখানে পবিত্র আদর্শ ও দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত হয়। নিজেদের স্ত্রী-সন্তানদের সামনে এবং নিজেদের সমাজ ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশে এমন আদর্শ স্থাপন করতে হবে, যা সমাজের কল্যাণ ও উন্নতির জন্য পথপ্রদর্শক হবে।

আমাদের উচিত, নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সংশোধনের জন্য, তাদের রক্ষা করার জন্য, তাদের মধ্যে ধর্মের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করার জন্য, তাদেরকে মহান আল্লাহ্র সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য এবং তাদের মধ্যে জামা'আতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য এমন আদর্শ স্থাপন করা, যা অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

সন্তানদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাদীক্ষার জন্য হজরত মসীহ্ মওউদ (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) একটি উপায় বাতলে দিয়েছেন। তা হলো, তাদের জন্য দোয়া করা। যেমন, তিনি (আ.) বলেন:

"প্রকৃত হেদায়াত ও প্রতিপালন মহান আল্লাহ্রই কাজ। অতিরিক্ত কঠোরভাবে পেছনে লেগে থাকা এবং কোনো একটি বিষয়ে অতিরিক্ত জোর দেওয়া, অর্থাৎ প্রতিটি কথায় সন্তানদের বাধা দেওয়া ও বারবার সংশোধন করতে থাকা-এমন আচরণ প্রকাশ করে যে, যেন আমরাই হেদায়াতের অধিকারী এবং আমরা তাদের নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী কোনো একটি পথে পরিচালিত করতে পারব। এটি একপ্রকার গোপন শিরক। আমাদের জামা'আতের এ থেকে বিরত থাকা উচিত। আমরা তো আমাদের সন্তানদের জন্য দোয়া করি এবং সাধারণভাবে নিয়মকানুন ও শিষ্টাচার শিক্ষার বিধান মেনে চলতে তাদের অভ্যস্ত করি। এর বেশি কিছু করি না। এরপর আমরা সম্পূর্ণরূপে মহান আল্লাহর ওপর ভরসা রাখি। যার মধ্যে সৌভাগ্যের বীজ নিহিত রয়েছে, সময় হলে তা সতেজ ও সজীব হয়ে উঠবে।"

(মালফুযাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫)

অতএব, সন্তানদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে উত্তম আদর্শ এবং দোয়ার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এ বিষয়টির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নিয়মিত আদায় করুন এবং মহান আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করার চেষ্টা করুন। প্রকৃতপক্ষে, যখন একজন মুমিন ও মুত্তাকী বান্দা নিজেকে মহান আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করে দেয়, তখন স্বয়ং আল্লাহ্তাআলা তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হজরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন:

"মহান আল্লাহ এ ধরনের লোকদের অভিভাবক হয়ে যান, যেমন তিনি বলেন: وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ (আল-আ'রাফ: ১৯৭)। অর্থাৎ, তিনি সৎকর্মশীলদের সঙ্গ দেন এবং তাদের অভিভাবক হয়ে যান। হাদীসে শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, মহান আল্লাহ তাদের সেই হাত হয়ে যান, যার দ্বারা তারা কোনো কিছু ধারণ করে; তিনি তাদের সেই চোখ হয়ে যান, যার দ্বারা তারা দেখে; তিনি তাদের সেই কান হয়ে যান, যার দ্বারা তারা শোনে এবং তিনি তাদের সেই পা হয়ে যান, যার দ্বারা তারা চলাফেরা করে। আর অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলীর সঙ্গে শত্রুতা করে, আমি তাকে বলি, আমার মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হও। অন্য এক স্থানে বলা হয়েছে, যখন কেউ আল্লাহর কোনো ওলীর ওপর আক্রমণ করে, তখন মহান আল্লাহ তার ওপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েন, যেমন কোনো সিংহী তার শাবককে কেউ ছিনিয়ে নিতে চাইলে ক্রোধে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।" (মালফুযাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৮০-৬৮১)

অতএব, কতই না সৌভাগ্যবান তারা, যাদের অভিভাবক স্বয়ং মহান আল্লাহ হয়ে যান! আর যাদের অভিভাবক মহান আল্লাহ হয়ে যান, তাদের দুঃখ ও ভয় দূর হয়ে যায় এবং ভবিষ্যতে সৎকর্ম সম্পাদনের প্রতি তাদের মনোযোগ সৃষ্টি হয়।

মনে রাখবেন, যখন মহান আল্লাহর সঙ্গে আমাদের এমন সম্পর্ক গড়ে উঠবে এবং দোয়ার প্রতি আমাদের এতটা দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি হবে যে, আমরা উপলব্ধি করব দোয়া ছাড়া আমাদের চলার কোনো উপায় নেই, তখন আমরা নিজেদের পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে বিনয়, আকুলতা ও আন্তরিক ব্যাকুলতা সৃষ্টির চেষ্টা করব এবং সন্তানদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করার চেষ্টা করব। তখন মহান আল্লাহর অনুগ্রহে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম রক্ষা পাবে। তারা সর্বদা ধর্মের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে এবং মহান আল্লাহর সঙ্গে তাদের সম্পর্কও ক্রমাগত আরও সুদৃঢ় হতে থাকবে।

মহান আল্লাহ আপনাদের এমন তৌফিক দান করুন, যেন আপনারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনকারী হন, নিজেদের সন্তানদের অবস্থার পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করেন এবং নিজেদের ঘরের পরিবেশ শান্তিপূর্ণ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ রাখেন। আমিন।

সমস্ত উন্নতি খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেছেন, "তোমরা ভালভাবে স্মরণ রাখবে, তোমাদের সমস্ত উন্নতি খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত। যেদিন তোমরা এ কথা বুঝতে অক্ষম হবে এবং খিলাফতকে কায়েম রাখবে না, সেদিন তোমাদের ধ্বংস ও সর্বনাশের দিন হবে। আর যদি তোমরা এ সত্যকে অনুধাবন কর এবং খিলাফতের এ নেযামকে কায়েম রাখ, তাহলে সমগ্র পৃথিবী যদি সম্মিলিতভাবে তোমাদেরকে ধ্বংস করতে চায়, তবুও তারা তা পারবে না। তোমাদের বিপরীতে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও অকৃতকার্য হয়ে থাকবে। যতদিন তোমরা একে (নেযামে খিলাফতকে) দৃঢ়ভাবে ধরে রাখবে ততদিন পৃথিবীর কোন বিরোধিতাই কার্যকর হবে না।" (দরসে কুরআন, পৃ. ৭৩, প্রকাশিত ১৯২১)

সম্মানিত পাঠকবৃন্দের প্রতি বিশেষ আবেদন

বদর পত্রিকার সহায়তা

বদর পত্রিকার এই সৌভাগ্য ও মর্যাদা রয়েছে যে, এটি সম্পূর্ণরূপে যুগের প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যনিষ্ঠ দাস, হযরত আকদাস মসীহ মওউদ আলাইহিস সালামের বরকতময় পৃষ্ঠপোষকতায় বিকশিত হয়েছে। সূচনালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত প্রথমে নবুওয়ত এবং পরবর্তীতে নবুওয়তের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত খেলাফতের ছায়াতলে এই পত্রিকা তবলীগ ও তরবিয়তের দায়িত্ব পালন করে আসছে। এই পত্রিকার মাধ্যমে বহু সৌভাগ্যবান আত্মা আহমদিয়াতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই পত্রিকার মাধ্যমে খেলাফতে আহমদিয়ার নির্দেশনার আলোকে আহমদি পরিবারগুলোর তারবিয়ত হচ্ছে এবং ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে।

পত্রিকা প্রস্তুত, প্রকাশ, প্যাকিং এবং পাঠানোর কাজে বিপুল ব্যয় হয়। কেবল সামান্য পরিমাণে গ্রাহক-চাঁদার মাধ্যমে এই ব্যয় পূরণ করা সম্ভব নয়। এর জন্য বিশেষ সহযোগীদের অত্যন্ত প্রয়োজন, যারা যুগের প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ (মামুর) -এরএই পত্রিকার ব্যয়ভার বহনে এগিয়ে আসবেন।

এই পত্রিকাকে যারা আর্থিকভাবে সহায়তা করবেন, আল্লাহ তাআলা কখনো তাদের বিনষ্ট হতে দেবেন না। কারণ আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি হলো: "নিশ্চয়ই আমি তার সাহায্যকারী, যে তোমাকে সাহায্য করবে।" অর্থাৎ, "যারা তোমার সাহায্য করবে, আমি তাদের সাহায্য করব।"

সহযোগীদের সকল বিষয়ের আল্লাহ তাআলা নিজেই রক্ষক হয়ে যাবেন এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদের ব্যবসা, চাকরি, বাগান, ফসল ও সম্পদে বহুগুণ বৃদ্ধি দান করবেন, ইনশাআল্লাহ।

যেকোনো ধরনের দিকনির্দেশনার জন্য সাপ্তাহিক বদর পত্রিকা-এর ম্যানেজার অফিসে যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগ নম্বর: 9815639670

মহান আল্লাহ্র বাণী

হে খোদার বান্দাগণ! নিজেদের হৃদয়কে নির্মল কর ও অন্তরকে ধুয়ে ফেল। তোমরা কপটতা ও দ্বৈততা (দু'মুখী স্বভাব)- এর দ্বারা সবাইকে রাজী করতে পার কিন্তু এ স্বভাবের দ্বারা তোমরা খোদার ক্রোধকে উত্তেজিত করবে।

(রাযে হাকীকাত, পৃ: ১০)

দোয়াপ্রার্থী: Late-Azima Khatun
From: Mirza Enayetulla Sb, Harhari, Murshidabad



জুমআর খুতবা

মহানবী (সাঃ)-এর খোদা-নির্ভরতা

"মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর মক্কা মুকাররমায় তেরো বছর ধরে যে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদের সময় অতিবাহিত হয়েছিল, সেই সময়ের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করলে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, মহানবী (সা.) বিপদাপদের সময় একজন পূর্ণ সত্যবাদীর যে চারিত্রিক গুণাবলি প্রদর্শন করা উচিত, অর্থাৎ আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল থাকা, অধৈর্য ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা, নিজের কাজে শিথিলতা প্রদর্শন না করা এবং কারও ভয়ে ভীত না হওয়া–এসব গুণ এমনভাবে প্রদর্শন করেছিলেন যে, তাঁর এই অবিচল দৃঢ়তা দেখে কাফেররাও ঈমান এনেছিল এবং সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও নির্ভরশীলতা না থাকলে কেউ এমন দৃঢ়তা এবং এভাবে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারে না।" ॥ –হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)

"রসূল করীম (সা.) এ ধরনের পার্থিব চিন্তায় নিমগ্ন মানুষদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তাঁর দৃষ্টি পৃথিবীর দিকে নিবদ্ধ ছিল না; বরং তাঁর দৃষ্টি ছিল আল্লাহ্র দিকে। পার্থিব উপায়-উপকরণ তাঁর বিবেচনায় ছিল না।" ॥ –হযরত মুসলে মওউদ (রা.)

"আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল সেই মানুষটি ... সুরাকাহকে ততটুকু গুরুত্বও দেন না, যতটুকু একটি ষাঁড়কে দেওয়া হয়। হযরত আবু বকর (রা.) এত সাহস ও বীরত্ব, এত ঈমান ও বিশ্বাস এবং তাঁর মধ্যে বিদ্যমান এত তাওয়াক্কুল ও নির্ভরশীলতা থাকা সত্ত্বেও বারবার পেছন ফিরে দেখতে থাকেন যে, সুরাকাহ এখন আমাদের কতটা কাছে চলে এসেছে। কিন্তু রসূল করীম (সা.) তাকে কোনো গুরুত্বই দেন না। শুধু উদ্বিগ্ন হওয়া কিংবা দ্রুত দৌড়ানো তো দূরের কথা, ভয় ও আতঙ্ক প্রকাশ করা তো আলাদা বিষয়; তিনি একবারও মুখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকাননি।" ॥ –হযরত মুসলে মওউদ (রা.)

"আল্লাহ্! আল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'লার ওপর কী অসাধারণ নির্ভরশীলতা! শত্রু ঘোড়া ছুটিয়ে এতটা কাছে চলে এসেছে যে, তাঁর কণ্ঠস্বর পর্যন্ত তার কাছে পৌঁছাতে পারে এবং তিনি তার তিরের নিশানার আওতায় এসে পড়েছেন। অথচ তিনি এমন অবস্থায়ও উদ্বিগ্ন হওয়া তো দূরের কথা, পবিত্র কুরআন পাঠ করে চলেছেন। ... এই নির্ভরশীলতা ও তাওয়াক্কুলের কি আর কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যেতে পারে? এমন কোনো মানুষ কি আছে, যে এত বিপজ্জনক মুহূর্তে এমন উদাসীনতা ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছে?"॥ –হযরত মুসলে মওউদ (রা.)

"কোন বিষয়টি ছিল, যা সেই সময় তাঁর হৃদয়কে এতটা দৃঢ় করে দিয়েছিল? কোন শক্তি ছিল, যা তাঁর সাহস ও মনোবলকে এতটা উচ্চতায় উন্নীত করেছিল? কোন আত্মিক শক্তি ছিল, যা তাঁর মধ্যে এ ধরনের অসাধারণ জীবনশক্তির সঞ্চার করেছিল? এগুলো ছিল আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতার বিস্ময়কর নিদর্শন এবং তাঁর প্রতি আস্থা রাখার ফলাফল। তিনি জানতেন, বাহ্যিক উপায়-উপকরণ আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। পৃথিবীর শক্তিগুলো আমাকে ধ্বংস করতে পারবে না; কারণ আকাশে এমন এক আল্লাহ্ রয়েছেন, যিনি আমাকে দেখছেন এবং যিনি এসব উপায়-উপকরণের সৃষ্টিকর্তা। অতএব, উপায়-উপকরণের সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে উপায়-উপকরণ কিছুই করতে পারে না।

তাঁর এই তাওয়াক্কুল বিফলে যায়নি; বরং আল্লাহ্ তা'লা তা পূর্ণ করেছিলেন। সুরাকাহ, যে দুইশত উটের লোভে এসেছিল, সে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে ফিরে গিয়েছিল। আল্লাহ্ তার হৃদয়ে এমন ভীতি সঞ্চার করেছিলেন যে, সে নীরবে ফিরে যাওয়ার মধ্যেই নিজের নিরাপত্তা উপলব্ধি করেছিল। শুধু তা-ই নয়, সে অন্য অনুসরণকারীদেরও ফিরিয়ে দিয়েছিল। ... এ হলো এমন তাওয়াক্কুল, যা কোনো মিথ্যাবাদী মানুষের মধ্যে থাকতে পারে না এবং কোনো প্রতারক হৃদয়ে স্থান পেতে পারে না। ... এ হলো এমন তাওয়াক্কুল, যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যায় না।"॥ –হযরত মুসলে মওউদ (রা.)

"মানবীয় কৌশল ও উপায়-উপকরণ অবলম্বন করার যতটুকু সুযোগ আপনার ছিল, আপনি ততটুকু পর্যন্ত সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। এরপর আল্লাহ্ তা'লার ওপর নির্ভর করতেন। অতএব, আপনার ঈমান অজ্ঞতা ও অলসতাপূর্ণ ঈমান ছিল না; বরং আপনার ঈমান ছিল প্রত্যক্ষ উপলব্ধি-নির্ভর ঈমান।

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১৮ সেপ্টেম্বর , ২০২৬, এর জুমুআর খুতবা (১৮ তাবুক, ১৪০৫ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর আল্লাহ তা'লার ওপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল (ভরসা)-এর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বিগত খুতবায় আমি মক্কা থেকে তাঁর হিজরত সংক্রান্ত ঘটনাবলি বর্ণনা করেছিলাম। সেই সফরের আরও কিছু বিস্তারিত বিবরণ ইতিহাসে সংরক্ষিত আছে, যা থেকে তাঁর তাওয়াক্কুলের (খোদানির্ভরতার) আরো একটি মহান দিক ফুটে ওঠে।

রেওয়ায়েতে রয়েছে, এই হিজরতের সময় সুরাক্বা বিন মালিক পুরষ্কারের লোভে মহানবী (সা.)-এর পিছু ধাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় । পরবর্তীতে সুরাক্বা বিন মালিক নিজেই ইসলাম গ্রহণের পর এই ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, কুরাইশ কাফেরদের দূত আমাদের নিকট আসে। তারা মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) উভয়ের মাথার মূল্য নির্ধারণ করে দেয় অর্থাৎ তাদের জন্য যারা তাঁদের উভয়কে হত্যা করবে বা বন্দী করতে পারবে, তাকে প্রত্যেকের বিনিময়ে একশত উটের রক্তপণ (পুরস্কার) প্রদান করা হবে।' সুরাক্বা বলেন, 'আমি আমার গোত্র বনু মুদলিজের এক বৈঠকে বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে আমাদের সামনে দণ্ডায়মান হয়। সে বলে, হে সুরাক্বা! আমি উপকূলের দিকে ছায়াসদৃশ কিছু দেখেছি– অথবা বলেছে যে, তিনজনের এক কাফেলাকে যেতে দেখেছি। আমার মনে হয় তারা মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর সঙ্গী হবেন। সুরাক্বা বিন মালিক বলেন, আমি বুঝতে পারি– নিশ্চিতভাবেই এটি মুহাম্মদ (সা.)-এরই কাফেলা। কিন্তু অন্য কেউ আমার সাথে এই পুরস্কারে ভাগ বসাবে– আমি তা চাই নি। তাই আমি তৎক্ষণাৎ পরিস্থিতির সংবেদনশীলতাকে নিয়ন্ত্রণ করলাম আর সংবাদদাতাকে চোখের ইশারায় চুপ থাকার ইঙ্গিত করলাম; ফলে সে চুপ হয়ে যায়। অবশ্য আমি প্রকাশ্যে বলি নি যে, "না না, এটি মুহাম্মদ (সা.)-এর কাফেলা হতে পারে না; বরং তুমি যাদের কথা বলছ তারা তো সবেমাত্র আমাদের সম্মুখ দিয়ে গেল –তারা অমুক গোত্রের লোক, যারা হারিয়ে যাওয়া উট খুঁজতে বেরিয়েছে। সুরাক্বা বলেন, আমি আরও কিছুক্ষণ সেই মজলিসে বসে রইলাম যেন কারও মনে কোনো সন্দেহ না জাগে। এরপর আমার এক সেবিকাকে চুপিসারে বললাম, তুমি আমার অমুক দ্রুতগামী ঘোড়াটি নিয়ে বাড়ির পেছনে অমুক স্থানে আমার অপেক্ষা কর। কিছুক্ষণ পর আমি নিজে সেখানে গিয়ে পৌঁছালাম। আমি তির দিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করলাম, কিন্তু ভাগ্য গণনা সফরের যাওয়ার বিরুদ্ধে বের হলো। তবুও আমি সেটিকে গুরুত্ব না দিয়ে ঘোড়ায় আরোহন করে বাতাসের গতিতে ছুটতে থাকলাম এবং সেই কাফেলার পিছু নিলাম, যাকে আমি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এরই কাফেলা বলে মনে করছিলাম। সুরাকা বলেন, একে একে মাইলফলক অতিক্রম করে আমি খুব দ্রুত সেই কাফেলার কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম। কাফেলার অদূরে অপ্রত্যাশিতভাবে আমার ঘোড়াটি হোঁচট খেল এবং আমি ছিটকে মাটিতে পড়ে গেলাম। আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং পুনরায় তির দিয়ে ভাগ্য যাচাই করলাম। এবারও ফল আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বেরোলো। কিন্তু আমি যেকোনো মূল্যে মুহাম্মদ (সা.)-কে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে একশত উটের পুরস্কার লাভ করার বিষয়ে দৃঢ়সংকল্প ছিলাম। তাই আবার উঠে ঘোড়ায় চেপে বসলাম। 'এবার আমি এত কাছে পৌঁছে গিয়েছিলাম যে আমি পরিস্কারভাবে শনাক্ত করতে পেরেছিলাম, তারা মুহাম্মদ (সা.) ও আবু বকর (রা.) ; কেবল তা-ই নয়, বরং মহানবী (সা.)-এর কুরআন তিলাওয়াতের সুমধুর কণ্ঠস্বরও শুনতে পাচ্ছিলাম। তিনি (সা.) এদিক-ওদিক তাকাননি, কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) বারবার পেছনে ফিরে তাকাচ্ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর নিরাপত্তার চিন্তায় হয়তো চারদিকে তাকাচ্ছিলেন। সুরাক্বা বলেন, এমন সময় আমার ঘোড়াটি আবার হোঁচট খেল এবং এর পা বালির গভীরে দেবে গেল। আমি আবারও ছিটকে পড়লাম। এরপর আমি ঘোড়াকে ধমক দিয়ে নিজে উঠে দাঁড়ালাম, কিন্তু ঘোড়াটির জন্য বালি থেকে পা বের করা অনেকটা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। অবশেষে যখন সে সোজা হয়ে দাঁড়াল, তখন তার দুই পায়ের নিচ থেকে ধুলো উড়ে আকাশে ধোঁয়ার মতো ছড়িয়ে পড়ল। আমি পুনরায় তীর দিয়ে ভাগ্য নির্ধারণ করতে গেলে এবারও সেটাই বের হলো যা আমি অপছন্দ করতাম। তখন আমি সেখান থেকেই নিরাপত্তা চেয়ে চিৎকার করে

বললাম, আমার হাতে আপনাদের কোনো ক্ষতি হবে না। এতে রসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলেন, তাকে জিজ্ঞাসা করো সে কী চায়। সুরাক্বা বলল, আমি সুরাক্বা, আমি আপনাদের সাথে কথা বলতে চাই। তখন তাঁরা থামলেন। সুরাক্বা বলে, মক্কাবাসীরা আপনাদের জীবিত বা মৃত ধরে আনতে পারলে একশত উট পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে এবং আমি সেই লোভেই আপনাদের পিছু ধাওয়া করার জন্য এসেছি। কিন্তু আমার সাথে যা যা ঘটেছে, তা দেখে আমি এই দৃঢ় বিশ্বাসে উপনীত হয়েছি যে আপনাদের পিছু ধাওয়া করা সঠিক নয়। সে মহানবী (সা.)-এর কাছে পাথেয় বা রসদ অর্থাৎ পানাহার দ্রব্য গ্রহণের প্রস্তাবও দিল, কিন্তু মহানবী (সা.) তা গ্রহণ করলেন না। তিনি (সা.) কেবল এতটুকু বললেন, আমাদের খবর অন্য কাউকে দেবে না। সুরাক্বা এই প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করল এবং একইসাথে নিবেদন করলো যে, আমার বিশ্বাস, একদিন আপনি অবশ্যই রাজত্ব লাভ করবেন আমাকে এইমর্মে একটি নিরাপত্তানামা লিখে দিন, যে আমি তখন আপনার সকাসে উপস্থিত হলে আমার সাথে সম্মানজনক আচরণ করা হবে।' কোনো কোনো রেওয়ায়েত অনুযায়ী, সে নিরাপত্তার লিখিত অঙ্গীকারনামা চেয়েছিল। তদনুসারে মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে হযরত আবু বকর (রা.) এবং অন্য একটি রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত আমীর বিন ফুহাইরা (রা.)-তাকে লিখে দিয়েছেন এবং সে সেটি নিয়ে ফিরে যায়। [সহীহ আল বুখারি, কিতাব মানাকিবুল আনসার, হাদীস-৩৯০৬]

এটিই ছিল মহানবী (সা.)-এর খোদানীর্ভরতার মহিমা! মনে কোনো ভয় ছিল না। মহান আল্লাহর বাণী পাঠ করতে করতে তিনি পথ চলছিলেন। তাঁর হৃদয়ে এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তাঁর কোন ক্ষতি হতে পারে না। সুরাক্বা যখন নিরাপত্তানামা চাইল, তিনি তাকে নিরাপত্তানামা লিখে দিলেন। সুরাক্বার হৃদয়ে এই ধারণা জেগেছিল যে, শেষ পর্যন্ত তাঁরই জয় হবে আর মহানবী (সা.)-এর হৃদয়ে এর চেয়েও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে বিজয় নিশ্চিতভাবেই তাঁরই, তাই তিনি নিরাপত্তানামা লিখে দিয়েছিলেন।

অপর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী, সে যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন মহানবী (সা.) তাকে সম্বোধন করে বললেন, হে সুরাক্বা! সেদিন তোমার অবস্থা কত ঈর্ষণীয় হবে যখন কিসরার (পারস্য সম্রাটের) কঙ্কণ তোমার হাতে পরিহিত থাকবে? সুরাক্বা বিস্ময়ে পেছনে ফিরে জিজ্ঞেস করল, কিসরা বিন হরমুযের কঙ্কণ? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ, সেই কিসরা বিন হরমুযেরই। পরবর্তীতে হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে যখন কিসরার কঙ্কণ, মুকুট ও কোমরবন্ধনী আনা হলো হলো, তখন হযরত ওমর (রা.) সুরাক্বাকে ডেকে পাঠালেন এবং বলেন, "তোমার হাত দাও। তিনি তাঁর হাতে সেই কঙ্কণ পরিয়ে দিয়ে বলেন, বলো, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি কিসরা বিন হরমুযের কাছ থেকে এগুলো নিয়ে আমাকে দান করেছেন। [মহম্মদ রসুলুল্লাহ ওয়াল্লাযীনা মাআহু, প্রণেতা-আব্দুল হামীদ, ৩য় খণ্ড পৃ: ৬৫]

হিজরতের সফরের এই ঘটনাকে হযরত মুসলেহ মওউদ রা.)-ও নিজের ভাষায় এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, হিজরতের ঘটনা এক বিস্ময়কর ভীতিজাগানিয়া ঘটনা। সমগ্র আরব তাঁর বিরোধী ও রক্তপিপাসু ছিল; কিন্তু মহানবী (সা.) মাত্র একজন সঙ্গী নিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। পথিমধ্যে এমন সব গোত্র বসবাস করত, যারা ধর্মীয় বিরোধের কারণে সর্বদা তাঁকে হত্যা করার সুযোগ খুঁজত এবং কেবল কুরাইশদের ভয়ে চুপ থাকত। কিন্তু এরপর এমন এক সময় এসে যায় যখন স্বয়ং কুরাইশরা তাঁর প্রাণনাশে উদ্যত ছিল। সমস্ত আরব গোত্র নিশ্চিৎ ছিল যে, আমরা যদি এই ব্যক্তিকে হত্যা করি তবে কুরাইশদের অসন্তুষ্ট হওয়ার কোনো কারণ থাকবে না। কেবল এটি নয় যে কুরাইশদের অসন্তোষের কোন ভয় ছিল না বরং মহানবী (সা.)-কে মক্কায় অনুপস্থিত দেখে তারা তাঁকে হত্যার জন্য বিপুল পুরস্কার নির্ধারণ করে রেখেছিল। মদীনার পথে বসবাসকারী সমস্ত গোত্রকে জানিয়ে দিয়েছিল যে, যে ব্যক্তি মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.)-কে জীবিত বা মৃত ধরে আনবে, তাকে মাথাপিছু ১০০টি করে উট পুরস্কার দেওয়া হবে। আরব গোত্রগুলো যাদের জীবনধারণের প্রধান উপায়ই ছিল লুটপাট এবং যারা হিংসার আগুনে আগেই জ্বলছিল, তারা কি এমন সুযোগ হাতছাড়া করতে পারত? চারদিকে তাঁর সন্ধান শুরু হলো। একথায় তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে এই আশংকা ছিল, যেকোনো সময় যেকোন রক্তপিপাসু শত্রুর মুখোমুখি হতে হবে। এমন স্পর্শকাতর পরিস্থিতিতে প্রায়শই দেখা যায়, পরম বীর পুরুষরাও মনোবল হারিয়ে বসে এবং শেষ চেষ্টাটুকু করে উঠতে পারে না। আর যদি ব্যতিক্রম হিসেবে কেউ অতি সাহসী ও শক্তিশালী হৃদয়ের মানুষও হয়, তার ওপরও ভয় এমনভাবে চেপে বসে যে, তার প্রতিটি গতিবিধি থেকে তা প্রকাশ পায়।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) লিখেছেন, আমি ইতিহাসে বহু মহান বীরের জীবনের ঘটনা পড়েছি, কিন্তু এমন সংকটের মুহূর্তে তাঁদের যে অবস্থা হতো, মহানবী (সা.)-এর ঘটনার সাথে এর তুলনা করাও সমীচীন নয়। ঐতিহাসিকরা জানেন, পলায়নরত নেপোলিয়নের কী দশা হয়েছিল এবং তার চেহারায় হতাশার কেমন সুস্পষ্ট ছাপ ফুটে উঠেছিল। তারা এটিও জানে যে, ভারত উপমহাদেশের সম্রাট হুমায়ুন কীভাবে বারবার নিজেকে শত্রুর হাতে সঁপে দিতে প্রস্তুত হয়ে যান।তাঁর সাথে যদি কয়েকজন অত্যন্ত বিশ্বস্ত সেনাপতি না থাকতো, তবে হয়তো তিনি তা-ই করে বসতেন। একইভাবে আরও বহু বীর সেনাপতি অতিক্রান্ত হয়েছেন, সংকটের মুহূর্তে যখন শত্রু চারদিক থেকে তাঁদের খোঁজে ছড়িয়ে পড়ে তাঁরা ঘাবড়ে যায়। কিন্তু মহানবী (সা.) এই পার্থিব লোকদের মতো ছিলেন না। তাঁর দৃষ্টি ইহজগতের দিকে নিবদ্ধ ছিল না, বরং তাঁর দৃষ্টি ছিল মহান আল্লাহর নিবদ্ধ। জাগতিক উপায়উপকরণ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি আদৌ ভাবেন নি , এমন সংকটাপন্ন মুহূর্তে অসহায় অবস্থায় কেবল একজন সঙ্গীকে নিয়ে আমি কী-ই বা করতে পারি? কিংবা এমন বিপজ্জনক পথে যদি শত্রু সামনে এসে পড়ে তবে তার মোকাবেলার জন্য আমার কী আয়োজন আছে! বরং তিনি দেখছিলেন যে, আমার সাথে সেই খোদা আছেন, যিনি চিরকাল থেকে তাঁর নেক বান্দাদের রক্ষক হিসেবে বিরাজমান এবং যার আঘাতের সামনে কোনো শত্রু টিকতে পারে না। সেই খোদা নূহের খোদা, ইব্রাহীমের খোদা, মূসার খোদা, ইউনুসের খোদা, আইয়ূবের খোদা, দাউদের খোদা, সোলায়মানের খোদা, মসীহ্‌র খোদা -তিনিই আমার খোদা! তাঁর শক্তি কখনো হ্রাস পায় না এবং তিনি এক মুহূর্তের জন্যও উদাসীন নন। সুরাক্বা বিন জু'শুম লোভ ও শত্রুতায় উন্মত্ত হয়ে ছুটে আসে এবং দূর থেকে দেখে মহানবী (সা.)-এর দিকে ঘোড়া ছুটায়। তার হৃদয়ে প্রত্যাশার উত্তাল তরঙ্গ খেলছিল যে, সে কেবল নিজ ধর্মের অবমাননাকারীর রক্তে হাত রঞ্জিত করে নিজের হৃদয়ের আগুনকে ঠাণ্ডা করতে চায় না, বরং ২০০ উটের পুরস্কারও লাভ করবে -অর্থাৎ ১০০ উট হযরত মহানবী (সা.)-এর জন্য এবং ১০০ উট হযরত আবু বকর (রা.)-এর জন্য নির্ধারিত ছিল। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) ২০০ উটের কথা উল্লেখ করেছেন। (প্রথম বর্ণনায় ১০০ উটের কথা আছে, তবে এখানে ২০০ উটের কথা রয়েছে অর্থাৎ দুজনের জন্য জনপতি ১০০ করে মোট ২০০ উট)।

এই বিপুল পুরস্কার যা তাকে নিজ গোত্রে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল -তার সাহসকে আরও বৃদ্ধি করে। শিকারী যেমন শিকার দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে, সেও মহানবী (সা.) -কে দেখে তাঁর দিকে ধেয়ে আসে এবং ধনুক-তির হাতে নিয়ে তাঁর ওপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। সে একা ছিল না, বরং একটি হাঁক দিয়ে তার চারপাশে হাজার হাজার মানুষকে জড়ো করতে পারত। সে ডাক দিলে তবে আশেপাশের গোত্রের লোকজন কাছাকাছিই ছিল, তারা চলে আসত; কারণ মহানবী (সা.) তখন তাদের এলাকা অতিক্রম করছিলেন। কিন্তু মহানবী (সা.) তখন কী করেন? তিনি কি পালিয়ে যান? ভয়ে কি নিজেকে তার হাতে তুলে দিয়েছিলেন? তাঁর পা কি দোদুল্যমান হয়? তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধি কি লোপ পেয়েছিল? তাকে হত্যা করে পালানোর পথ খোঁজার ইচ্ছা করেন কি? সে তখন একা এত কাছে এসে গিয়েছিল যে মহানবী (সা.)-ও তাকে তির মেরে বধ করতে পারতেন!

" না, খোদার ওপর পূর্ণ ভরসাকারী সেই মহামানব এসবের একটি কাজও করেননি। তিনি সুরাক্বাকে তুচ্ছ এক ষাড়ের সমপরিমাণ গুরুত্বও দেননি! হযরত আবু বকর (রা.)-এর মধ্যে অত বিপুল সাহস ও বীরত্ব থাকা সত্ত্বেও, তাঁর মধ্যে যে ঈমান, একীন ও তাওয়াক্কুল বিদ্যমান ছিল তা সত্ত্বেও তিনি বারবার পেছনে ফিরে দেখছিলেন যে, সুরাক্বা আমাদের অনেক কাছে এসে গিয়েছে। কিন্তু মহানবী (সা.) তার বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা করেন নি, ভয় পাওয়া বা পালিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, তাঁর চেহারায় ভয়ভীতির চিহ্নও প্রকাশ পায়নি; তিনি একবার মুখ ফিরিয়েও তার দিকে তাকাননি! এটি সুরাক্বাকে চরম বিস্ময়ের সাগরে নিমজ্জিত করল এবং তার চোখ খুলে দিল যে, আমি কোন্ মানুষের পিছু ধাওয়া করছি! জীবনভর সে স্মৃতি থেকে এই দৃশ্য মুছে ফেলতে পারেনি। বরং এই অলৌকিক ঘটনা তার হৃদয়ে এমন গভীরভাবে রেখাপাত করে যে, সে সবসময় তা বর্ণনা করত এবং বলত, আমি ঘোড়া ছুটিয়ে মহানবী (সা.) -এর এত কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলাম যে, তাঁর কুরআন তিলাওয়াতের কণ্ঠস্বর

যুগ খলীফার বাণী

কঠিন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের একটিই পথ- আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নতজানু হও। (খুতবা, জুমআ, ১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: Late Shohrae Alam & Alia Bibi
From-Mahmood Alam Sb. Barisha, 24 PGS (s)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সুদ খাইও না যাহা (ধন-সম্পদ ও অনিষ্টকে) বহুগুণে বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার। (আলে ইমরান: ১৩১)

দোয়াপ্রার্থী: Azizur Rahaman Sb, Lalbag, Murshidabad

শুনতে পাচ্ছিলাম। আমি দেখলাম, মহানবী (সা.) ডানে-বামে মোটেই তাকান না ; অবশ্য হযরত আবু বকর (রা.) বারবার তাকাচ্ছিলেন।

কত অসাধারণ বিষয়! মহান আল্লাহর ওপর কত নিটোল ভরসা! শত্রু ঘোড়া ছুটিয়ে এত নিকটে চলে এসেছে যে মহানবী (সা.)-এর কণ্ঠস্বর তার কান পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছিল এবং তিনি (সা.) তিরের লক্ষ্যের ভেতর ; অথচ তিনি ঘাবড়ানো তো দূরের কথা, পক্ষান্তরে তিনি কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করে চলেছেন আর অপরদিকে হযরত আবু বকর (রা.) বারবার তাকাচ্ছিলেন যে শত্রু কতই না কাছে এসে গেছে। এই ভরসা ও তাওয়াক্কুলের আর কোনো দৃষ্টান্ত আছে কি? এমন কোনো মানুষ কি আছে, যে এরূপ বিপজ্জনক মুহূর্তে এমন পরম অনবধানতা ও ভ্রুক্ষেপহীনতা প্রদর্শন করে থাকবে? যদি তাঁর মনে জাগতিক উপায়-উপকরণ ব্যবহারের সামান্য চিন্তাও থাকত, তবে অন্তত এতটুকু তো হওয়া উচিত ছিল যে তিনি সেসময় হয় সুরাক্বার ওপর আক্রমণের চেষ্টা করতেন, নয়তো সেখান থেকে দ্রুত সরে পড়ার চেষ্টা করতেন। কিন্তু তিনি (সা.) এই দুটি বিষয়ের একটিও করেননি। না তিনি (সা.) গতি বৃদ্ধি করেছেন, আর না তিনি এই সংকল্প করেছেন যে, কোনোভাবে সুরাকাকে হত্যা করবেন; বরং অত্যন্ত প্রশান্তির সাথে, কোনো প্রকার ভয়-ভীতি প্রকাশ না করে, নিজের পূর্বের গতিতে কুরআন শরীফ পড়তে পড়তে চলতে থাকেন।

সেটি কোন্ শক্তি ছিল, যা তাঁর (সা.) মনোবলকে এতটা দৃঢ় করে দিয়েছিল? সেটি কোন্ প্রেরণা ছিল, যা তাঁর (সা.) মাঝে এমন অসাধারণ জীবনের সঞ্চার করেছিল? এগুলো ছিল খোদার ওপর তাওয়াক্কুলের বিস্ময়কর নিদর্শন, তাঁর ওপর নির্ভরতার ফলাফল। তিনি (সা.) জানতেন যে, বাহ্যিক উপকরণগুলো আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। জাগতিক শক্তিগুলো আমাকে ধ্বংস করতে পারবে না। কেননা উর্ধ্বলোকে একজন খোদা আছেন যিনি আমাকে দেখছেন, যিনি এই সমস্ত উপকরণের স্রষ্টা। অতএব, উপকরণের স্রষ্টার বিরুদ্ধে উপকরণ কিছুই করতে পারে না। তাঁর (সা.) এই তাওয়াক্কুল বৃথা যায়নি, বরং খোদা তা পূর্ণ করেছেন। আর সুরাকা, যে দুইশত উটের লোভে এসেছিল, সে তাঁর (সা.) কাছে ক্ষমা চেয়ে ফিরে যায়। আর খোদা তার হৃদয়ে এমন ভীতির সঞ্চার করেছিলেন যে, সে চুপচাপ ফিরে যাওয়ার মাঝে মঙ্গল নিহীত বলে মনে করেছে; বরং সে অন্যান্য পশ্চাদ্ধাবনকারীদেরও ফিরিয়ে দিয়েছিল।

এটি সেই তাওয়াক্কুল, যা একজন মিথ্যাবাদীর মাঝে থাকতে পারে না, যা একটি প্রতারক হৃদয়ে বিরাজমান থাকতে পারে না। এটি সেই তাওয়াক্কুল, যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যায় না।

হযরত মূসা (আ.)-এর জীবনেও একবার এই ধরণের তাওয়াক্কুলের দৃষ্টান্ত দেখা যায় কিন্তু সেই দৃষ্টান্ত এর তুলনায় অনেক তুচ্ছ। কেননা, হযরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গীরা ফেরাউনীদের দেখে বলেছিল, إِنَّا لَمُدْرَكُونَ 'অর্থাৎ আমরা নিশ্চিত ধরা পড়ে গেলাম!'(সূরা আশ শুআরা ২৬:৬২) এতে হযরত মূসা (আ.) উত্তরে বলেছিলেন, إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ অর্থ- নিশ্চয় আমার প্রতিপালক-প্রভু আমার সাথে আছেন, আর অবশ্যই তিনি আমাকে (সঠিক) পথ দেখাবেন। (সূরা আশ-শুআরা ২৬:৬৩)। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সা.)-এর তাওয়াক্কুল এতটা পূর্ণাঙ্গীন ছিল যে, সেটি তাঁর সঙ্গীদের ওপরেও প্রভাব বিস্তার করে আর হযরত আবু বকর (রা.) মূসা (আ.)-এর অনুসারীদের মতো ঘাবড়ে গিয়ে এ কথা বলেন নি যে, আমরা নিশ্চয় ধরা পড়ে যাবো। বরং গুহায় বসে এ কথা বলেছেন, তারা যদি নীচে তাকায় তাহলে আমাদের দেখে ফেলবে। এই ঈমান সেই প্রতিফলনের ফলাফল ছিল যা সে সময় নবুওয়্যতের জ্যোতি তাঁর অন্তরে সৃষ্টি করছিল। দ্বিতীয়ত, হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে সেনাবাহিনী ছিল আর তাদের সম্মুখে পালিয়ে যাওয়ার মতো স্থান নিশ্চিতভাবেই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর সাথে কোন জামাত ছিল না, আর তাঁর সম্মুখে অন্য কোন পথও ছিল না।" [আনোয়ারুল উলুম, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৯১-৪৯৬]

অতএব, এই হলো তাঁর তাওয়াক্কুলের অসাধারণ মর্যাদা।

বাহ্যিক উপকরণের ব্যবস্থা করা ও ব্যবহার করা এরপর আল্লাহ্ তা'লার ওপর তাওয়াক্কুল করা, এটি জরুরী বিষয়। মহানবী (সা.)-এর তাওয়াক্কুলের উল্লেখ করতে গিয়ে এই গূঢ় কথাটি হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এভাবে বর্ণনা করেছেন, সে ব্যক্তি যাঁর খোদা তা'লার সত্তার ওপর দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, আবার একইসাথে তাঁর এই দৃঢ় বিশ্বাসও থাকে যে, আমাকে তিনি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, সে কিভাবে কর্ম পরিত্যাগ করতে পারে? সে তো কর্মশক্তিতে সবচেয়ে বলিয়ান হয়ে থাকে। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর কর্ম তাঁর ঈমানের জোরে ছিল। কেননা, যে ব্যক্তি বিশ্বাস করেন যে, একজন খোদা রয়েছেন আর তিনি আমাকে বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, সে সেই উদ্দেশ্য অর্জন করার জন্য চেষ্টাও করে। লক্ষ্য করে দেখ! মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.) যেখানে ঈমানের বহিঃপ্রকাশ করেন সেখানে সওর গুহায় বসে হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলেন, আবু বকর! ভয় পেয়ো না। খোদা আমাদের সাথে আছেন। তিনিই আমাদের রক্ষক। সেখানে তিনি (সা.) ধর্মের অন্যান্য কাজে দিন রাত এতটা ব্যস্ত থাকেন যে মনে হয় যেন, খোদা তা'লার সকল কাজ তাঁর ওপরেই ন্যস্ত করা হয়েছে। একদিকে যদি তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস থেকে থাকে যে, খোদা আছেন আর তিনি নিজ বান্দাদের সাহায্য করেন, অপরদিকে তিনি খোদার পরীক্ষা নিচ্ছেন এমনটা চোখে পড়ে না। এমন নয় যে, খোদা বলেছেন, আমি অবশ্যই তোমাকে বিজয় দান করবো, তাই পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকবেন আর বলবেন, এখন বিজয়ের জন্য কোন পরিশ্রম করার কী প্রয়োজন রয়েছে? আল্লাহ্ নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী স্বয়ং বিজয় দান করবেন। তিনি (সা.) এমনটি করেন নি। বরং বিজয়ের জন্য সংগ্রামও করেছেন। তিনি (সা.) লোকদের যুদ্ধের কলা কৌশল শিখিয়েছেন, সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, শত্রুদের প্রতিদ্বন্দ্বীতায় সেনাবাহিনী একত্রিত করেছেন, বাহনের ব্যবস্থা করেছেন, অস্ত্র একত্রিত করেছেন, সৈন্যদের রশদ ও আবাসন প্রভৃতির ব্যবস্থা করেছেন। এ সমস্ত ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করার পর শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে যান আর যখন এমন কোন সময় আসে যখন শত্রু সংখ্যায় বেশি আর সাহাবীরা সংখ্যায় স্বল্প, তখন তিনি অত্যন্ত দৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থা এবং ঈমানের সাথে বলেন, আমরা সংখ্যায় অল্প হওয়া সত্ত্বেও বিজয় আমাদেরই হবে।

কাজেই মানবিক কৌশল ও চেষ্টাপ্রচেষ্টা যতটুকু করা সম্ভব ছিল, তিনি তার সবই করতেন এবং এরপর আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করতেন। অতএব, তাঁর ঈমান অজ্ঞতা ও অলসতাপূর্ণ ঈমান ছিল না, বরং তাঁর ঈমান পর্যবেক্ষণমূলক ঈমান ছিল। আর অভিজ্ঞতালব্ধ ঈমান সেই ব্যক্তিরই হয়ে থাকে যে একইসাথে তাওয়াক্কুলও করে, আবার কাজেও লেগে থাকে। অর্থাৎ, তাওয়াক্কুল ও কর্ম একই সাথে করে।" [আনোয়ারুল উলুম, ১৭তম খণ্ড, পৃ: ৯৭-৯৮]

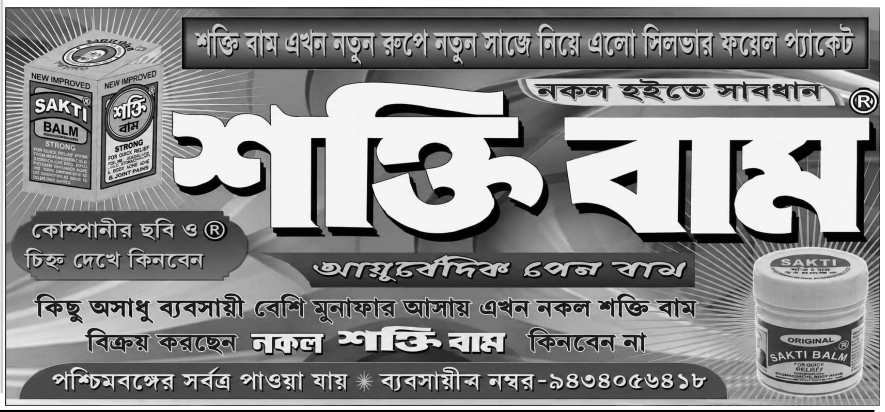
হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, "সেই বিপদসঙ্কুল যুগ যা আমাদের মহানবী (সা.)-এর ওপর তেরো বছর যাবত মক্কাতে বিরাজমান ছিল, সেই যুগের ইতিহাস পাঠ করলে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জানা যায়, মহানবী (সা.) কঠিন বিপদের সময় একজন পূর্ণ সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির যেসব নৈতিক গুণাবলির বহিঃপ্রকাশ করা উচিত, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা রাখা, হা হুতাশ ও অস্থিরতা থেকে দূরে থাকা, নিজের কাজে অলসতা বা দুর্বলতা না দেখানো এবং কারো ভয়ে ভীত না হওয়া ইত্যাদি গুণ তিনি এমনভাবে প্রদর্শন করেছিলেন যে, কাফিররা তাঁর এই দৃঢ়তা দেখে ঈমান আনয়ন করেছিল এবং তারা সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, আল্লাহ্‌র ওপর পূর্ণ বিশ্বাস ও ভরসা না থাকলে কেউ এ ধরনের অবিচলতা প্রদর্শন করতে পারে না এবং এরূপ দুঃখ-কষ্ট সইতেও পারে না।

[ইসলামি ওসুল কি ফিলাসফি, রূহানী খাযায়েন, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৪৪৭]

মহানবী (সা.) আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা রাখার পাশাপাশি উপায়-উপকরণেরও সদ্ব্যবহার করেছেন।

এ বিষয়ে যেমনটি আমি বলেছি বিভিন্ন ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে একটি হাদিসও রয়েছে যা হযরত উবাই বিন কাব (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিনি (রা.) বলেন, যখন মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবিগণ মদিনায় আসেন এবং আনসাররা তাঁদের নিজেদের কাছে আশ্রয় দেন, তখন সমগ্র আরব তাঁদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য সমবেত হয়ে যায়। মুসলমানদের অবস্থা এমন ছিল যে তাঁরা অস্ত্র ছাড়া রাত কাটাতেন না এবং সকালেও সসস্ত্রই থাকতেন। ঘুমন্ত কিংবা জাগ্রত সব অবস্থাতেই তাঁরা অস্ত্র সাথে রাখতেন। তাঁদের আল্লাহ্‌র ওপর পূর্ণ ভরসা ছিল। পাশাপাশি তাদের এ ব্যাপারে সতর্কও থাকতে হতো, যে কোনো সময় আক্রমণ হতে পারে। তাই তাঁদের সর্বদা সজাগ ও প্রস্তুত থাকতে হতো এবং নিজেদের সুরক্ষার ব্যবস্থাও করতে হতো।

এ বিষয়ে হযরত আয়েশা (রা.)-এর একটি বর্ণনায় আরও বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। তিনি বলেন, যখন হযরত মহানবী (সা.) মদিনায় আসেন, তখন এক রাতে তিনি জাগ্রত ছিলেন। এরপর তিনি (সা.) বললেন, হায়! আমার সাহাবিদের মধ্যে যদি কোনো পুণ্যবান ব্যক্তি আজ রাতে আমাকে পাহারা দিত! হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, সেই অবস্থায় হঠাৎ অস্ত্রের ঝনঝনানি শব্দ শুনতে পেলাম। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, কে? উত্তর এলো, আমি সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস। মহানবী (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, কোন বিষয়টি তোমাকে এখানে আসতে উদ্বুদ্ধ করেছে? তিনি (রা.) নিবেদন করেন, আপনার নিরাপত্তা নিয়ে আমার চিন্তার উদ্রেক হয়েছিল। তাই আপনার পাহারার জন্য উপস্থিত হয়েছি। মহানবী (সা.) তখন তাঁর জন্য দোয়া করেন। এরপর তিনি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েন।



অপর এক রেওয়াতে হযরত আয়েশা (রা.) এই ঘটনাটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমি অস্ত্রের ঝংকার শুনতে পেলাম। তখন মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, কে? তাঁরা উত্তর দিলেন, সাদ ও হুযাইফা। অর্থাৎ এই বর্ণনায় দুইজন ব্যক্তির কথা এসেছে। আমরা আপনার (সা.) পাহারার জন্য এসেছি। এরপর মহানবী (সা.) ঘুমিয়ে পড়েন, এমনকি আমি তাঁর গভীর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাই। এ সময়েই এই আয়াত নাযিল হলো। অর্থাৎ ওহী নাযিল হওয়ার সময় তাঁর (সা.) নিঃশ্বাস প্রশ্বাস এমন হতো। তিনি বলেন, এ সময়েই এই আয়াত وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ অবতীর্ণ হয় অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে সে সকল মানুষদের (অনিষ্ট) থেকে রক্ষা করবেন (সূরা মায়েদা-৬৮)। মহানবী (সা.) তখন তাঁবু থেকে মাথা বের করে বললেন, হে লোকসকল! এবার ফিরে যাও, আল্লাহ্ তা'লা আমার সুরক্ষার দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছেন।

[আল জামিউ লি আহকামুল কুরআন, আয়াত-৬৮, পৃ: ১১০৪]

অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চয়তা বিধান করা হয় নি, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে কোনো শুভসংবাদ পাওয়া যায় নি, ততক্ষণ তিনি পাহারার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু যখন আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে তাঁকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেওয়া হলো, তখন তিনি বললেন, তোমরা চলে যাও, এখন আল্লাহ্ তা'লা আমার সুরক্ষা করবেন।

মহানবী (সা.) যখন বিভিন্ন রাজা-বাদশাহদের কাছে ইসলামের প্রচারমূলক পত্র প্রেরণ করেন, তখন পারস্যের সম্রাট কিসরা চরম অহংকারবশত তাঁর পত্রটি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে। যখন মহানবী (সা.) এই ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারেন, তখন তিনি খোদা তা'লার প্রতি পূর্ণ ভরসা রেখে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের টুকরো টুকরো করে দিন।

কিসরা ইতিমধ্যে ইয়েমেনের গভর্নরের মাধ্যমে মহানবী (সা.)-কে গ্রেফতার করার উদ্দেশ্যে দুজন সৈন্যকে পত্র সহকারে পাঠিয়েছিল।

তিনি চিঠির বিষয়বস্তু শুনেন, যাতে লেখা ছিল- অনতিবিলম্বে তাদের হাতে নিজেকে তুলে দিন। এ বিপজ্জনক মুহূর্তে মহানবী (সা.) কোনো প্রকার ভয়ভীতি প্রকাশ না করে দূতদের বললেন, আজ রাতে তোমরা এখানেই অবস্থান করো, কাল সকালে আমি তোমাদের উত্তর দেবো। পরদিন সকালে তিনি দূতদের বললেন, তোমরা ফিরে যাও এবং তোমাদের মনিব তথা ইয়েমেনের গভর্ণরকে (অর্থাৎ ইয়েমেনের শাসকের মাধ্যমে বাদশা বার্তা পাঠিয়েছিলেন) গিয়ে বলো, আমার প্রতিপালক-প্রভু আজ রাতে তোমার প্রভুকে অর্থাৎ কিসরা-কে হত্যা করেছেন। তারা একথা শুনে হতবাক হয়ে যায় এবং সেখান থেকে ফিরে যায়। পরবর্তীতে জানা গেল, ঠিক ওই রাতেই খসরু পারভেজকে তার নিজের ছেলে সাইরাস হত্যা করেছিল। [সীরাত খাতামন্নবীঈন, পৃ: ৮১৫-৮১৬]

এ মহান ঘটনাটি আল্লাহ তা'লা কর্তৃক তাঁর অলৌকিক নিরাপত্তা এবং মহানবী (সা.)-এর খোদাভরসার এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

মহানবী (সা.) পূর্ণ তাওয়াক্কুল নিয়ে আল্লাহর অনুমতিক্রমে যুদ্ধে যেতেন এবং বের হওয়ার সময় দোয়াও করতেন। এই বিষয়ে হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সা.) যখন কোনো যুদ্ধে বের হতেন, তখন বলতেন, اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَضُدِيْ وَاَنْتَ نَصِيْرِيْ وَبِكَ اُقَاتِلُ [অর্থ: হে আল্লাহ! তুমিই আমার বাহু এবং তুমিই আমার সাহায্যকারী আর তোমারই সাহায্যে আমি যুদ্ধ করি।

[সুনান তিরমিযি, আবওয়াবুদ দাওয়াত, হাদীস-৩৫৮৪]

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মানুষের বিপদের সময় অস্থিরতা বা ব্যাকুলতা তৈরি হওয়া স্বাভাবিক হলেও তাওয়াক্কুলকে কখনো হাতছাড়া করা উচিত নয়। মহানবী (সা.)- এর বদর যুদ্ধের সময় চরম উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছিল; যেমন তিনি আকুল মিনতি জানিয়ে দোয়া করেন, يَا رَبِّ اِنْ اَهْلَكْتَ هٰذِهِ الْعِصَابَةَ فَلَنْ تُعْبَدَ فِي الْاَرْضِ اَبَدًا অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! তুমি যদি এই ছোট দলটিকে ধ্বংস করে দাও, তবে আর কখনোই পৃথিবীতে তোমার ইবাদত করা হবে না।]

কিন্তু মহানবী (সা.)-এর এই ব্যাকুলতা ছিল কেবল মানবিক দুর্বলতার দাবির বশে; কারণ অপরপক্ষে তাওয়াক্কুলকে তিনি বিন্দুমাত্র হাতছাড়া করেননি। তাঁর দৃষ্টি আকাশের দিকে নিবদ্ধ ছিল এবং সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আল্লাহ তা'লা আমাকে কখনোই বিনষ্ট করবেন না। তিনি নিরাশা বা হতাশাকে কাছে ঘেষতে দেননি। এমন ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা আসাও মানুষের চারিত্রিক উৎকর্ষতা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যই আবশ্যক; কিন্তু মানুষের উচিত হতাশাকে কাছে ভিড়তে না দেওয়া। কারণ 'ইয়াস' বা নৈরাশ্য হলো কুফর আর আর নিরাশা-হতাশা হলো কাফেরদের বৈশিষ্ট্য। মানুষের মনে নানা প্রকার চিন্তাভাবনা অস্থিরতা ও কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করে থাকে, কিন্তু ঈমান সেই কুমন্ত্রণা দূর করে দেয়। মানবীয় দুর্বলতা ব্যাকুলতা সৃষ্টি করে, আর ঈমান তা প্রতিহত করে। "

[মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড , পৃ: ২৭১-২৭২]

এরপর মহান আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের সেই বিখ্যাত ঘটনা রয়েছে -যখন মহানবী (সা.)-কে নিঃসঙ্গ পেয়ে এক শত্রু তাঁর ওপর তরবরি উঁচিয়ে ধরেছিল, তখন তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বলেছিলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে তোমার হাত থেকে রক্ষা করবেন।

[সহীহ বুখারি কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪১৩৫]

এই ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-ও নিজের অনবদ্য ভঙ্গিতে লিখেছেন, মহান আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের অবস্থা এমন ছিল যে, যখন এক ব্যক্তি তাঁকে একাকী পেয়ে তাঁর ওপর তরবরি উঁচিয়ে ধরল এবং জিজ্ঞেস করল, এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? সেসময় মহানবী (সা.) সম্পূর্ণ নিরস্ত্র থাকা সত্ত্বেও এবং শায়িত অবস্থায় নড়াচড়া করার সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও পরম প্রশান্তচিত্তে ও ধীরস্থিরভাবে জবাব দিলেন, আল্লাহ! এই শব্দটি এত সুদৃঢ় ঈমান ও বিশ্বাসের সাথে তাঁর মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল যে, সেই কাফেরের হৃদয়ও মহানবী (সা.)-এর ঈমানের উচ্চতা এবং বিশ্বাসের পূর্ণতাকে স্বীকার না করে পারল না আর তার হাত থেকে তরবরি খসে পড়ল। যে তাকে হত্যা করতে এসেছিল, সে অপরাধীর মতো মহানবী (সা.)-এর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে!"

[দীবাচা তফসীরুল কুরআন, আনওয়ারুল উলুম, খন্ড-২০, পৃ: ৩৮৬]

খন্দকের বা পরিখার যুদ্ধে মুসলমানরা চরম অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করছিল। মদীনায় থেকে শত্রুর মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল আর এটি কোনো ভয় বা আল্লাহ তা'লার প্রতি ভরসার অভাবে ছিল না বরং তা ছিল একটি রণকৌশলের অধীনে। তখন মদীনার চারপাশে পরিখা খনন করা হয়েছিল যেন শত্রুদের অকস্মাৎ আক্রমণের মুখে পরিখার কল্যাণে নিরাপদ থাকা যায়। মুসলমানদের অধিকাংশই ছিলেন গরীব এবং খেটে খাওয়া মানুষ। এই দরিদ্রতা সত্ত্বেও সবাই সমবেত হয়ে এই পরিখা খননে অংশগ্রহণ করেন যেন এই আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত থাকা যায়। যারা দিনমজুরী করতে পারতেন না তারা ক্ষুধার্ত থাকতেন। সেই সময় সারা আরবের বহু গোত্র একত্রিত হয়ে আক্রমণ করেছিল। বিভিন্ন রেওয়ায়েতে তাদের সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন উল্লেখ করা হয়েছে। যাহোক, এই সংখ্যা ন্যূনতম দশ হাজার বলা হয়ে থাকে। কোথাও পনেরো হাজার আবার কোথাও চব্বিশ হাজার বলা হয়েছে। দশ হাজার সংখ্যাটিও মদীনার জনসংখ্যার নিরিখে অনেক বড়ো ছিল। এই ছোটো শহরের নিরিখে এটি বিশাল সৈন্যবাহিনী ছিল। [সীরাত খাতামন্নবীঈন, পৃ: ৫৭৪]

যাইহোক, মুসলমানরা নিজেদের অভাব-অনটন এবং দারিদ্র সত্ত্বেও এই যুদ্ধের জন্য এবং সংখ্যায় নগণ্য হওয়া সত্ত্বেও এত বিশাল সৈন্যদলের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। আর স্বল্পসংখ্যক হবার কারণে শহরের অভ্যন্তরে থেকে মোকাবিলা করার কৌশল অবলম্বন করা হয় । আল্লাহ তা'লার এটিও অনুগ্রহ ছিল যে, আল্লাহ তা'লা আগেই বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছিলেন। মুসলমানদের ঈমানে দৃঢ়তা এসে গিয়েছিল এবং শত্রুর সংখ্যাধিক্য দেখে তাঁরা বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি; বরং মহানবী (সা.)-এর তাওয়াক্কুল সেসময় মুসলমানদের তাওয়াক্কুলকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। বিরোধীদের ও মুনাফিকদের নানারকম বিরূপ কথাবার্তা শোনা সত্ত্বেও তাঁদের মনোবল ভেঙ্গে পড়েনি।

অতঃপর দেখুন! অবিচলতা এবং তাওয়াক্কুলের ফলে আল্লাহ তা'লাও এমন ব্যবস্থা করলেন যে, ধূলিঝড় এবং ঝঞ্ঝাবায়ু কাফিরদের ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলে আর তারা পলায়ন করে। এমন হতবিহ্বলতা ও হুলুস্থুল পরিস্থিতির মধ্যে পলায়ন করে যে, বিপুল পরিমাণে নিজেদের রসদ ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী ফেলে রেখে পালিয়ে যায় যা মুসলমানদের কাজে আসে। অতএব এই ছিল আল্লাহ তা'লার ওপর তাওয়াক্কুল করার ফলাফল।

আহযাব বা পরিখার যুদ্ধে অল্প খাবারে পুরো বাহিনীর তৃপ্ত হওয়ার ঘটনাও দেখতে পাওয়া যায়। তা যেমন ছিল একদিকে মুজিযা, অন্যদিকে মহান আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের এক মহান দৃষ্টান্ত।

এক রেওয়াতে রয়েছে, হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমরা খন্দকের যুদ্ধের দিনে মাটি কাটছিলাম, এমন সময় এক শক্ত পাথর সামনে এসে পড়ে। সাহাবীগণ নবী করীম (সা.)-এর নিকট এসে নিবেদন করেন, খন্দকে একটি শক্ত পাথর বেরিয়ে এসেছে। তিনি (সা.) বলেন, আমি নামছি অর্থাৎ, তিনি নিজে পাথরটি ভাঙতে এলেন। তিনি উঠে দাঁড়ালেন আর সেসময় তাঁর পেটে পাথর বাঁধা ছিল। খালি পেট হওয়ার কারণে সেই যুগে পেটে পাথর বেঁধে রাখা হতো যেন শক্তি বোধ হয়। টানা তিন দিন আমরা কিছুই খাইনি – অনাহারের এ ছিল চিত্র! নবী করীম (সা.) কোদাল হাতে নিয়ে পাথরটিতে আঘাত করলেন, সেটি গড়িয়ে পড়া বালুর স্তূপের মত হয়ে যায় বা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। হযরত জাবের বলেন, মহানবী (সা.)-এর এমন করুণ অবস্থা দেখে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল (সা.)! আমাকে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দিন। আমি গিয়ে আমার স্ত্রীকে বললাম, আমি মহানবী (সা.)-এর মাঝে এমন একটি বিষয় দেখেছি যা সহ্য করা যায় না। অর্থাৎ আমি দেখেছি, ক্ষুধা লাঘবের জন্য তিনি পেটে পাথর বেঁধে রেখেছেন। তোমার কাছে কি কোনো খাবার আছে? তিনি বললেন, কিছু ভুট্টা আর ছাগলের একটি ছোটো বাচ্চা আছে।

অতএব আমি সেই ছানাটি জবাই করি এবং তিনি (আমার স্ত্রী) ভুট্টা পিষে নেন। আমরা পাথরের হাঁড়িতে মাংস চড়িয়ে দিই। এরপর মহানবী (সা.)-এর কাছে আসি। ততক্ষণে আটা পিষা হয়ে গেছে, খামির তৈরি হয়ে গেছে আর উনুনে হাঁড়ির রান্না প্রায় শেষ হতে চলেছে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল (সা.)! আমার ঘরে কিছু খাবার আছে। হে আল্লাহর রসূল! আপনি আসুন আর দু'এক জনকে সাথে নিন যেন খাবার খেতে পারেন। তিনি (সা.) জিজ্ঞাসা করেন, কতটুকু খাবার আছে? আমি তাঁকে বিস্তারিত বললাম। তিনি (সা.) বললেন, অনেক। একটি ছাগলের বাচ্চার মাংস আর সামান্য কিছু যব আছে, কোনো সমস্যা নাই, অনেক খাবার, যথেষ্ট আছে এবং এটি উত্তম খাবারও বটে।

এরপর তিনি আমাকে বললেন, তোমার স্ত্রীকে গিয়ে বলো, আমি না আসা পর্যন্ত যেন চুলা থেকে হাঁড়ি না নামায় এবং তন্দুর থেকে রুটি না বের করে। এরপর নবী করীম (সা.) সাহাবীদের বললেন, ওঠো! তদনুসারে মুহাজির ও আনসারগণ উঠে দাঁড়ালেন। হযরত জাবের স্ত্রীর কাছে গিয়ে বললেন, তোমার মঙ্গল হোক! নবী করীম (সা.) মুহাজির, আনসার এবং তাঁদের সাথে যারা আছেন সবাইকে সাথে নিয়ে চলে এসেছেন! তাঁর স্ত্রী বললেন, হুযূর (সা.) কি আপনার কাছে খাবারের পরিমাণ জিজ্ঞেস করেছিলেন? জাবির বললেন, হ্যাঁ, আমি সব বিস্তারিত বলেছি। মহানবী (সা.) সাহাবীদের সাথে নিয়ে এসে বললেন, ভেতরে প্রবেশ করো, তবে হুড়োহুড়ি করো না অর্থাৎ, তাড়াহুড়ো না করে শান্তভাবে ভেতরে গিয়ে বসো। তিনি রুটির টুকরো নিয়ে তাতে মাংস ঢেলে সাহাবীদের পরিবেশন করা আরম্ভ করেন। কাপড়ে ঢাকা রুটি টুকরো করে সামান্য মাংস তুলে সাহাবীদের পরিবেশন করতেন। হাঁড়ি ও তন্দুর থেকে যখনই কিছু নিতেন, তা আবার ঢেকে দিতেন। এভাবে তিনি করতে থাকেন যতক্ষণ না সকল সাহাবীর পূর্ণ তৃপ্তি হয়। সকলের পেট ভরে গেল এবং তখনও কিছু খাবার বেঁচে গেল! রসূলুল্লাহ (সা.) হযরত জাবেরের স্ত্রীকে বললেন, নাও, এবার তোমরা খাও এবং অন্যদেরও উপহারস্বরূপ পাঠাও, কারণ মানুষ চরম অনাহার ক্লিষ্ট। [সহীহ বুখারি, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪১০১]

অতএব একদিকে যেমন ছিল পরম তাওয়াক্কুল, অন্যদিকে ছিল বরকতের দোয়া -যার ফলে খাবারে বিপুল বরকত হয়েছিল।

পুনরায় এক রওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি হযরত বারাআ বিন আযেব (রা.)-কে জিজ্ঞেস করল, আপনারা কি হুনাইনের যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সা.)-কে ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন?' তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে রসূলুল্লাহ (সা.) ময়দান ছেড়ে যাননি। হাওয়াযিন গোত্র ছিল তিরন্দাজ। যখন তাদের সাথে সংঘর্ষ আরম্ভ হয় আমরা তাদের আক্রমণ করলাম, তারা পরাস্ত হলো। মুসলমানরা গণিমতের মাল সংগ্রহ করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু শত্রু হঠাৎ বিপরীত দিক থেকে তির বর্ষণ শুরু করে দিল। রসূলুল্লাহ (সা.) নিজ স্থান থেকে একচুলও নড়েননি। আমি দেখেছি, তিনি তাঁর সাদা খচ্চরে আরোহিত ছিলেন এবং আবু সুফিয়ান বিন হারিস বিন আব্দুল মুত্তালিব এর লাগাম ধরে রেখেছিলেন। আর নবী করীম (সা.) এই কবিতাটি আবৃত্তি করছিলেন, اَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

"আমি প্রতিশ্রুত নবী, এতে কোনো মিথ্যা নেই, আমি আবদুল মুত্তালিবের পুত্র।"]। সহীহ বুখারি, কিতাবুল হজ্জ, হাদীস-২৮৬৪]

এই ঘটনার উল্লেখ হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-ও করেছেন এবং কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা করে বলেছেন, মহানবী (সা.)-এর এই কথা বলা যে আমি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান, পুত্র" ।সে সময় শত্রুর আক্রমণ এতটাই তীব্র ছিল যে, শত্রুর চার হাজার তিরন্দাজ বৃষ্টির মত তির ছুড়ছে আর এ অবস্থায় আমার সামনে এগিয়ে যাওয়া মানবীয় শক্তির অতীত বিষয় আর আমার কোনো ভয় নেই! এর অর্থ কিন্তু এটা নয়। তিনি (সা.) কবিতাটি পড়েছিলেন-যাতে কেউ ধোঁকা না খায়, যেন এমন মনে না করে যে আমার মধ্যে কোনো ঐশী শক্তি রয়েছে। আমি তো আবদুল মুত্তালিবের পুত্রই এবং একজন মানুষ। শুধু আল্লাহ তা'লার সাহায্য আমার নবী হওয়ার কারণে আমার সঙ্গে আছে।মহান আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের মহিমা হলো, যেহেতু আল্লাহ আমাকে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাই তিরের এই বৃষ্টির মধ্যেও তিনি আমাকে বিজয়ী করবেন!

আল্লাহ তা'লার ওপর তাওয়াক্কুল এবং তাঁর প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাসের আরও একটি উদাহরণ রয়েছে। একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, প্রারম্ভিক ঘটনাগুলো দেখুন বা জীবনের শেষ দিকের ঘটনাগুলো দেখুন-একই তাওয়াক্কুলের উদাহরণ সর্বত্র দেখা যায়।

এটি বদরের যুদ্ধের ঘটনা, প্রথম যুদ্ধের ঘটনা। মদিনায় হুবাইব বিন ইউসাফ নামের একজন অত্যন্ত শক্তিশালী ও সাহসী ব্যক্তি ছিল। তখন মুসলমানদের অবস্থা খুবই নাজুক ছিল। এই ব্যক্তি খাজরাজ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং বদরের যুদ্ধের আগ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেনি। কিন্তু সে তাঁর গোত্র খাযরাজের লোকদের সঙ্গে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। যুদ্ধ জয় হলে গনীমতের মাল লাভ করবে- এমন আশাও তার ছিল। মুসলমানেরা এতে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন যে, সে-ও তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছে। কিন্তু মহানবী (সা.) তাঁকে বললেন, 'আমাদের সঙ্গে কেবল সেই ব্যক্তিই যুদ্ধে যাবে, যে আমাদের ধর্মের অনুসারী।' একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, হুযূর (সা.) তাকে বলেছিলেন, 'তুমি ফিরে যাও। আমরা কোনো মুশরিকের সাহায্য গ্রহণ করতে চাই না।' হুবায়ব বিন ইউসাফ (রা.) দ্বিতীয়বারও হযরত মহানবী (সা.)-এর কাছে এলেন। কিন্তু হুযূর (সা.) দ্বিতীয়বারও তাকে ফেরত পাঠান। অবশেষে তৃতীয়বার সে যখন আসে, তখন মহানবী (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান রাখ?' সে বললো, 'হ্যাঁ।' এরপর সে ইসলাম গ্রহণ করে এবং অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে

।আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড ,পৃ: ২০৪]

অতএব তিনি (সা.) এই প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং চরম প্রয়োজনের মধ্যেও অবিশ্বাসী থাকা অবস্থায় সেই ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ করেননি। কারণ, তিনি মনে করতেন যে, এভাবে কোনো অমুসলিমের সাহায্য গ্রহণ করা আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতিসমূহের প্রতি বিশ্বাস এবং তাঁর ওপর তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেন:

"অধুনাকালের বুদ্ধিমান লোকদের দৃষ্টিতে কাউকে নিজের শত্রু বানানো একটি ভুল। কিন্তু সত্য কথা হলো এটিও সত্যতার একটি নিদর্শন। তোমরা দেখো, মহানবী (সা.) কারও কপটতামূলক বন্ধুত্ব রাখেননি অর্থাৎ প্রত্যেকেই তাঁর শত্রু হয়ে যায়। সত্য বলার কারণে সকলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কেননা কেউ সত্য কথা শুনতে চাইতো না তাই মানুষের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। এই লোকদের দৃষ্টিতে তো নাউযুবিল্লাহ তিনি (সা.) ভুল করেছিলেন। অথচ কেবল আল্লাহর জন্য সকলের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়াই তাঁর সত্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণ। এর দ্বারা তাঁর ঈমানী শক্তির অবস্থা জানা যায়।

একদিকে তিনি (আ.) হযরত ঈসা (আ.)-এর দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, 'দেখো, ইনজিলসমূহে যে শিক্ষা পাওয়া যায়। অনেকে এপ্রেক্ষাপটে আপত্তি করে তাই তিনি বলছেন যে 'ইনজিলে যে শিক্ষা রয়েছে, আমি তারই আলোকে কথা বলছি।' এতে প্রতীয়মান হয় যে, কাউকে অসন্তুষ্ট করা কোনোভাবে তাঁর স্বভাবগত বৈশিষ্ট ছিল না। ইহুদীদের বলা হয়েছিল, 'আমি তাওরাতের একটি হরফও পরিবর্তন করতে আসিনি।'

এর বিপরীতে মহানবী (সা.)-এর শিক্ষার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পৃথিবীর এমন কোনো ফিরকা বা ধর্ম দৃষ্টিগোচর হবে না, যাকে তিনি ইসলামের প্রতি আহ্বান জানান নি এবং যার অসারতা তিনি প্রমাণ করেননি। আর এর পাশাপাশি প্রত্যেকের মোকাবিলায় তিনি নিজের সফলতাও ঐশী সাহায্য লাভের দাবিও করেছেন। তিনি শুধু ভুল-ত্রুটি চিহ্নিত করেননি; বরং তিনি এই দাবিও করেছেন যে, 'আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আমার পূর্ণ বিশ্বাস ও তাওয়াক্কুল রয়েছে এবং ইনশাআল্লাহ্ আমি সফলতা অর্জন করবো, কারণ আমি তাঁর পক্ষ থেকে এসেছি।' তিনি (আ.) বলেন, 'তাহলে তোমরা বলো, যতক্ষণ পর্যন্ত কারো আল্লাহ্ তালার প্রতি পূর্ণ ভরসা ও বিশ্বাস না থাকে, সে কি কখনোও এমনটি করতে পারে?'[মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩৯]

"আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলে মুহাম্মদ ও বারিক ও সাল্লিম ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ"

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى وَاٰلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

[আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ১১ অক্টোবর, ২০২৬]

*****

১৩১ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২৬ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৫, ২৬ ও ২৭ শে ডিসেম্বর ২০২৬ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

মহান আল্লাহ্র বাণী

সময় সংকীর্ণ এবং জীবনের কর্তব্য অনন্ত। দ্রুত চল, কারণ সন্ধ্যা আগত প্রায়। (আমাদের শিক্ষা, পৃ: ১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Sk Imam Hossain sb, Khundanga, Bankura

সীরাত খাতামান নাবীঈন

-মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ.(রা.)

নবুয়তের সূচনা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাইআত গ্রহণের পদ্ধতি

এ প্রসঙ্গে এ কথা উল্লেখ করা সমীচীন যে, যখন কোনো ব্যক্তি মুসলমান হওয়ার জন্য আসতেন, তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদ্ধতি ছিল এই যে, তিনি তাঁর হাত নিজের হাতে নিয়ে নির্ধারিত শব্দাবলির মাধ্যমে তাঁকে ইসলামের স্বীকৃতি প্রদান করাতেন এবং এই অঙ্গীকার গ্রহণ করতেন যে, ভবিষ্যতে তিনি প্রত্যেক ন্যায়সংগত ও সৎকাজে তাঁর আনুগত্য করবেন। ইসলামের স্বীকৃতি গ্রহণ করার সময় মৌলিক বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়ে স্বীকৃতি নেওয়া হতো। উদাহরণস্বরূপ, এই অঙ্গীকার করানো হতো যে, আমি আল্লাহকে এক, অদ্বিতীয় ও শরিকবিহীন বলে বিশ্বাস করব এবং কোনো প্রকার শিরক করব না। চুরি, ব্যভিচার, হত্যা, মিথ্যা বলা ইত্যাদি সব ধরনের ঘৃণ্য কাজ থেকে বিরত থাকব।

নারীদের কাছ থেকে বাইআত গ্রহণ করার সময়ও তিনি সেই একই অঙ্গীকার গ্রহণ করতেন, যা পুরুষদের কাছ থেকে নেওয়া হতো। তবে তিনি নারীদের হাত নিজের হাতে নিতেন না; বরং শুধু মৌখিকভাবে অঙ্গীকার গ্রহণ করতেন। পরবর্তীকালে যখন সশস্ত্র জিহাদ-সম্পর্কিত বিধান অবতীর্ণ হয়, তখন তিনি বাইআতের মধ্যে জিহাদ সম্পর্কিত শব্দাবলিও সংযোজন করেন। কিন্তু নারীদের বাইআত শেষ পর্যন্ত সেই প্রাথমিক পদ্ধতিতেই বহাল ছিল।

বাইআত ছাড়াও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদ্ধতি ছিল এই যে, তিনি গায়রে মাহরাম নারীদের সঙ্গে করমর্দন করতেন না। আর পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর শরিয়তের বিধান অনুযায়ী গায়রে মাহরাম নারী ও পুরুষের পরস্পরের সামনে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ করা-তা দৃষ্টির মাধ্যমে হোক কিংবা স্পর্শ ইত্যাদির মাধ্যমে-নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়।

প্রাথমিক গোপন প্রচার এবং কুরাইশদের আচরণ

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় তিন বছর পর্যন্ত সাধারণত গোপনে ইসলামের প্রচার চালিয়েছিলেন। ফলে সে সময় মুসলমানদের এমন কোনো নির্দিষ্ট কেন্দ্রও ছিল না, যেখানে তাঁরা একত্রিত হতে পারতেন। বরং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং অন্যান্য মুসলমানের প্রচারের ফলে যেসব সত্যসন্ধানী ব্যক্তি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আসতেন, তাঁদের সঙ্গে তিনি সাধারণত নিজের ঘরের ভেতরেই সাক্ষাৎ করতেন অথবা শহরের বাইরে কোনো স্থানে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হতেন।

এই গোপনীয়তার প্রভাব এতটাই ছিল যে, কোনো কোনো সময় মুসলমানেরা নিজেরাই একে অপরের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি জানতে পারতেন না। এর একটি কারণ ছিল, সে সময় মুসলমানেরা সাধারণত নিজেদের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি গোপন রাখতেন। কুরাইশদের নেতাদের কানে তো এ খবর খুব কমই পৌঁছাত। কিন্তু কখনো যদি তাঁদের কাছে খবর পৌঁছাতও, তবু সে সময় সাধারণত তাঁরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনো বিরোধিতা করতেন না। বরং তাঁদের বিরোধিতা কার্যত হাসি-ঠাট্টার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। কারণ, তাঁরা এই সমস্ত কার্যকলাপকে শিশুদের খেলা বলে মনে করতেন।

আর কখনো কোনো ব্যক্তি যদি অধিক কঠোরভাবে বিরোধিতা করতেন, তাহলে তা ছিল তাঁর ব্যক্তিগত আচরণ। সে সময় ইসলামের বিরুদ্ধে কুরাইশদের পক্ষ থেকে কোনো সম্মিলিত বিরোধিতামূলক প্রচেষ্টা ছিল না।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলামের মৌলিক স্তম্ভসমূহ

ইসলামের মূলনীতিগুলোর আলোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে। অর্থাৎ, ইসলামী শরিয়তের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর মধ্যে আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তাওহিদের ওপরই প্রধান গুরুত্ব আরোপ করা হতো। এরপর ছিল রসুলগণের প্রতি ঈমান, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান এবং প্রতিদান ও শাস্তির প্রতি বিশ্বাস।

প্রকতপক্ষে, এগুলো এমন মৌলিক নীতি যে, গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, সবকিছুই এই নীতিগুলোর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু পরবর্তীকালে যেভাবে এগুলো এবং অন্যান্য মৌলিক বিষয়কে সুসংবদ্ধভাবে ঈমানের স্তম্ভ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছিল, প্রাথমিক যুগে পরিস্থিতি তেমন ছিল না।

আমলের মৌলিক স্তম্ভগুলোর অবস্থাও একই রকম ছিল। বরং বর্তমানের মৌলিক ইবাদতসমূহ-যেমন নামাজ, রোজা, হজ ও জাকাত-এর মধ্যে কোনোটি তখনও নিয়মিত ও বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবে হাদিস থেকে এতটুকু প্রমাণিত হয় যে, প্রাথমিক পর্যায়ে হযরত জিবরাইল (আ.) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামাজ ও অজুর পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের প্রচলন হয়েছিল অনেক পরে। আর রোজা ও অন্যান্য বিধান কার্যকর হয়েছিল তারও অনেক পরে।

প্রাথমিক পর্যায়ে শুধু নামাজই ছিল, তাও নফল ইবাদতের রূপে। অর্থাৎ, সেই প্রাথমিক দিনগুলোতে মুসলমানেরা নিজেদের সুবিধামতো ঘরে অথবা মক্কার নিকটবর্তী পাহাড়ি গিরিপথে দু-চারজন একত্রিত হয়ে সুযোগমতো সাধারণ ইবাদতের রূপে নামাজ আদায় করতেন।

এ প্রসঙ্গে প্রাথমিক যুগের ইতিহাসবিদেরা লিখেছেন যে, একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং হযরত আলী (রা.) মক্কার একটি পাহাড়ি গিরিপথে নামাজ আদায় করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ সেদিক দিয়ে আবু তালিব চলে এলেন। আবু তালিব তখনও ইসলাম সম্পর্কে কোনো খবর জানতেন না। তাই তিনি দাঁড়িয়ে অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে এই দৃশ্য দেখতে লাগলেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ শেষ করলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ভাতিজা! তুমি কোন ধর্ম গ্রহণ করেছ?

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "চাচা! এটি আল্লাহর ধর্ম এবং ইবরাহিমের ধর্ম।"

এরপর তিনি সংক্ষেপে আবু তালিবকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু আবু তালিব এ কথা বলে বিষয়টি এড়িয়ে গেলেন যে, "আমি আমার পিতৃপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করতে পারব না।"

তবে একই সঙ্গে তিনি নিজের পুত্র হযরত আলী (রা.)-এর দিকে ফিরে বললেন, "হ্যাঁ, বৎস! তুমি অবশ্যই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গ দাও। কারণ, আমার বিশ্বাস, সে তোমাকে কল্যাণ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর দিকে আহ্বান করবে না।"

সম্ভবত এই সময়ের কাছাকাছি আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল। হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) এবং আরও কয়েকজন মুসলমান একটি পাহাড়ি গিরিপথে একত্রিত হয়ে নামাজ আদায় করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ কয়েকজন মুশরিক সেখানে এসে উপস্থিত হয়। মুসলমানদের নতুন ধরনের এই ইবাদত করতে দেখে তারা তাঁদের তিরস্কার করে। এর ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে কিছুটা বাদানুবাদও হয়েছিল।

প্রকাশ্যে ইসলামের প্রচার শুরু

এই প্রাথমিক যুগ এভাবেই নীরব ও গোপন প্রচারের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়ত লাভের প্রায় তিন বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল এবং চতুর্থ বছর শুরু হয়েছিল। এমন সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে এই নির্দেশ অবতীর্ণ হলো- فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ

অর্থাৎ, হে রাসুল! আপনাকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা স্পষ্টভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দিন।[হিজর:৯৫]

এর কাছাকাছি সময়ে এই আয়াতটিও অবতীর্ণ হয়েছিল:

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

"আর আপনার নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনকে সতর্ক করুন।" [শো'রা: ২১৫]

এই নির্দেশাবলি অবতীর্ণ হলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফা পর্বতে আরোহণ করলেন। এরপর উচ্চস্বরে আহ্বান জানিয়ে এবং প্রত্যেক গোত্রের নাম ধরে ধরে কুরাইশদের ডাকলেন।

সবাই একত্রিত হলে তিনি বললেন, "হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আমি যদি তোমাদের এই সংবাদ দিই যে, এই পাহাড়ের অপর পাশে একটি বিশাল সৈন্যবাহিনী রয়েছে, যারা তোমাদের ওপর আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত, তাহলে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে?

বাহ্যত এটি ছিল এমন একটি কথা, যা বিশ্বাস করা অত্যন্ত কঠিন বলে মনে হতে পারত। কিন্তু সবাই বলল, "হ্যাঁ, আমরা অবশ্যই বিশ্বাস করব। কারণ, আমরা আপনাকে সর্বদা সত্যবাদী হিসেবেই পেয়েছি।"

তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তাহলে শোনো! আমি তোমাদের সংবাদ দিচ্ছি যে, আল্লাহর শাস্তির বাহিনী তোমাদের নিকটবর্তী হয়ে গেছে। এই শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো।"

কুরাইশরা যখন এই কথাগুলো শুনল, তখন তারা উচ্চস্বরে হেসে উঠল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আবু লাহাব তাঁকে সম্বোধন করে বলল: تَبًّا لَكَ أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا

"তুমি নিপাত যাও। এই উদ্দেশ্যেই কি তুমি আমাদের একত্রিত করেছিলে?

এরপর সবাই হাসি-ঠাট্টা করতে করতে সেখান থেকে চলে গেল।

যুগ ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! কাজ তারাই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: Noor Jahan Begum, (Kolkata)

সীরাতুল মাহদী

-হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ.

১০৮) পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

কাজী আমির হুসাইন সাহেব আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার আমরা হজরত সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "হুজুর! হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, সকল নবীই ছাগল চরিয়েছেন। হুজুরও কি কখনো ছাগল চরিয়েছেন?

হযরত মসীহে মওউদ (আ.) বললেন, "হ্যাঁ। একবার আমি মাঠের দিকে গিয়েছিলাম। সেখানে একজন লোক ছাগল চরাচ্ছিল। সে আমাকে বলল, 'আমি একটু কাজে যাচ্ছি, আপনি আমার ছাগলগুলোর দেখাশোনা করবেন।' কিন্তু সেই লোকটি সেই যে গেল, একবারে সন্ধ্যায় ফিরে এল। তার ফিরে আসা পর্যন্ত আমাকে তার ছাগলগুলো চরাতে হয়েছিল।"

১০৯) পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

এই অধম নিবেদন করছে যে, হজরত খলিফাতুল মসীহ আউয়াল (প্রথম খলিফা) বলতেন, যখন ফতহে ইসলাম ও তওযীহে মারাম প্রকাশিত হয়েছিল, তখনও বই দুটি আমার কাছে পৌঁছায়নি, অথচ একজন বিরোধীর কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। সে তার সঙ্গীদের বলল, "দেখো, এবার আমি মওলভি সাহেবকে, অর্থাৎ আমাকে, মির্জা সাহেবের থেকে আলাদা করে দিচ্ছি।"

অতঃপর সে আমার কাছে এসে বলল, "মওলভি সাহেব! মহানবী (সা.)-এর পরে কি কোনো নবী হতে পারেন? আমি বললাম, "না।"

সে বলল, "যদি কেউ নবুওয়তের দাবি করেন, তাহলে? আমি বললাম, "তাহলে আমরা দেখব, তিনি সত্যবাদী ও যথার্থ সত্যনিষ্ঠ কি না। যদি তিনি সত্যবাদী হন, তাহলে যেকোনো অবস্থায় তাঁর কথা গ্রহণ করব।"

আমার এই উত্তর শুনে সে বলল, "বাহ, মওলভি সাহেব! আপনি তো আমার ফাঁদে পড়লেন না!

এই ঘটনা বর্ণনা করে হজরত মওলভি সাহেব বলতেন, "এ তো কেবল নবুওয়তের বিষয়। আমার তো এই বিশ্বাস যে, হজরত মসীহে মওউদ (প্রতিশ্রুত মসীহ) যদি শরিয়ত প্রবর্তক নবী হওয়ার দাবিও করেন এবং কোরআনের শরিয়তকে রহিত বলে ঘোষণা করেন, তাহলেও আমি তাঁকে অস্বীকার করব না। কারণ, যখন আমরা আপনাকে প্রকৃত সত্যবাদী ও আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত বলে পেয়েছি, তখন আপনি যা-ই বলবেন, তা-ই সত্য হবে। আর আমরা বুঝে নেব যে, 'খাতামুন নবিয়্যিন' আয়াতটির অন্য কোনো অর্থ রয়েছে।"

এই অধম নিবেদন করছে যে, প্রকৃতপক্ষে যখন কোনো ব্যক্তির আল্লাহতাআলার পক্ষ থেকে আগত হওয়ার বিষয়টি অকাট্য প্রমাণের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন তাঁর কোনো দাবির বিষয়ে আপত্তি তোলা বা সংশয় প্রকাশ করা মহান প্রতিপালকের বিরোধিতা করার শামিল হয়ে দাঁড়ায়।

(তবে হজরত মওলভি সাহেব যা বলেছিলেন, তা ছিল কেবল একটি নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা কথা। অন্যথায় আমাদের বিশ্বাস-এবং এটিই হজরত মসীহে মওউদ (আ.)-এর শিক্ষা-যে, কোরআনের শরিয়তই সর্বশেষ শরিয়ত। অতএব, হজরত মওলভি সাহেবের এই কথাগুলোকে সেই দৃষ্টিভঙ্গিতেই বুঝতে হবে, যে দৃষ্টিভঙ্গিতে আল্লাহতাআলা পবিত্র কোরআনে বলেন: قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ

"বলুন, যদি পরম করুণাময় আল্লাহর কোনো সন্তান থাকত, তাহলে আমিই সর্বপ্রথম তাঁর ইবাদতকারী হতাম।"

- (সুরা আয-যুখরুফ, ৪৩:৮২)

১১০) পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

মিয়াঁ আবদুল্লাহ সাহেব সানৌরি আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, প্রতিশ্রুত পুত্রের ভবিষ্যদ্বাণীর পর হজরত সাহেব মাঝে মধ্যে আমাদের বলতেন, "তোমরা দোয়া করো, যেন আল্লাহতাআলা আমাদের শিগগিরই সেই প্রতিশ্রুত পুত্র দান করেন।"

সেই দিনগুলোতে হজরতের বাড়িতে গর্ভধারণের অবস্থা ছিল। একদিন বৃষ্টি হলে আমি মসজিদে মুবারকের ওপরের প্রাঙ্গণে গিয়ে অনেক দোয়া করলাম। কারণ, আমি হজরত সাহেবের কাছ থেকে শুনেছিলাম যে, বৃষ্টির সময় দোয়া করলে তা অধিক পরিমাণে কবুল হয়।

এরপর দোয়া করতে করতে আমার মনে হলো, বাইরে জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে দোয়া করি। কারণ, হজরত সাহেবের কাছ থেকে এ কথাও শুনেছিলাম যে, বাইরে জঙ্গলে গিয়ে দোয়া করলেও তা অধিক পরিমাণে কবুল হয়। আমি মনে করলাম, দোয়া কবুল হওয়ার এই দুটি সুযোগই যখন আমার জন্য একসঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে, তখন এগুলোকে কাজে লাগানো উচিত।

অতঃপর আমি কাদিয়ান থেকে পূর্ব দিকে চলে গেলাম এবং বাইরের জঙ্গলে বৃষ্টির মধ্যে দীর্ঘক্ষণ সিজদায় পড়ে দোয়া করতে থাকলাম। বলতে গেলে, সেদিন আমার প্রায় পুরো দিনটাই বৃষ্টির মধ্যে কেটেছিল।

সেদিন সন্ধ্যায় অথবা পরদিন সকালে হজরত সাহেব আমাকে বললেন, "আমার প্রতি ওহি অবতীর্ণ হয়েছে যে, 'তাদের বলে দাও, তারা অনেক কষ্ট সহ্য করেছে; তাদের জন্য অনেক সওয়াব হবে।'

আমি নিবেদন করলাম, "হুজুর! এই ওহিটি তো আমার সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।"

হজরত বললেন, "কীভাবে? আমি তাঁকে আমার দোয়া করার সম্পূর্ণ ঘটনা শোনালাম। হজরত আনন্দিত হলেন এবং বললেন, "এমনটাই মনে হচ্ছে।"

এরপর এই আনন্দে আমি এক আনার বাতাসা বিতরণ করলাম। কিন্তু তখনও আমি এই ওহির প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারিনি। পরে যখন ইসমত জন্মগ্রহণ করল, তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, প্রকৃতপক্ষে এই ওহির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, যদিও আমার দোয়া কবুল হবে না, তবুও আমি সওয়াব লাভ করব।

১১১) পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

মিয়াঁ আবদুল্লাহ সাহেব সানৌরি আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, যখনও হুজুর (আ.) বাইআতের ব্যবস্থা শুরু করেননি, তখন একবার আমি হজরতের কাছে নিবেদন করলাম, "হুজুর! আমাকে আপনার বাইআত গ্রহণ করার সুযোগ দিন।"

তিনি (আ.) বললেন, "পিরের কাজ ভাঙ্গি বা মেথরের কাজের মতো। মুরিদের মলমূত্র নিজের হাতে পরিষ্কার করে ধুয়ে দিতে হয়। আর এই কাজের প্রতি আমার স্বাভাবিকভাবেই ঘৃণা বোধ হয়।"

আমি নিবেদন করলাম, "হুজুর! তাহলে অন্তত কোনো সম্পর্ক তো থাকা উচিত। আমি এখানে আসি, কিন্তু উপর-উপর এসেই চলে যাই।"

হুজুর বললেন, "আচ্ছা, তুমি আমাদের ছাত্র হয়ে যাও এবং আমাদের কাছে পবিত্র কোরআনের অনুবাদ পড়ো।"

এরপর ঈদের দিন হুজুর বললেন, "যাও, এক আনার বাতাসা নিয়ে এসো, যাতে তুমি আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের ছাত্র হয়ে যেতে পারো।"

আমি বাতাসা নিয়ে এসে সামনে রাখলাম। হুজুর সেগুলো বিতরণ করলেন এবং আমাকেও কিছু দিলেন।

এরপর হুজুর প্রতি সপ্তাহে আমাকে কোরআনের একটি আয়াতের সরল অর্থ পড়িয়ে দিতেন। কখনো কখনো কোনো আয়াতের সামান্য তফসিরও বর্ণনা করতেন।

একদিন তিনি বললেন, "মিয়াঁ আবদুল্লাহ! আমি তোমাকে পবিত্র কোরআনের গভীর তত্ত্ব ও নিগূঢ় জ্ঞান এ জন্য জানাই না যে, তোমার মধ্যে সেগুলো ধারণ করার ক্ষমতা আমি দেখতে পাই না।"

মিয়াঁ আবদুল্লাহ সাহেব বলতেন, "আমি এর অর্থ এটাই বুঝেছি যে, যদি সেই সময় আমাকে সেসব বিষয় জানানো হতো, তাহলে আমি পাগল হয়ে যেতাম। কিন্তু আপনার কাছে আমি যে এই সরল অনুবাদ পড়েছিলাম-সম্ভবত অর্ধ পারার কাছাকাছি-সেই অনুবাদই আজ পর্যন্ত আমার মধ্যে কোরআন বোঝার ব্যাপারে একটি বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করে রেখেছে।"

এ ছাড়া মিয়াঁ আবদুল্লাহ সাহেব বর্ণনা করতেন যে, একবার আমি হজরত সাহেবের কাছে নিবেদন করলাম, "হুজুর! আমি যখন কাদিয়ানে আসি, তখন অন্য কোনো বিশেষ বিষয় তেমন অনুভব করি না। কিন্তু আমি লক্ষ করি যে, এখানে সময়ে সময়ে হঠাৎ করে পবিত্র কোরআনের কোনো কোনো আয়াতের অর্থ আমার কাছে উন্মোচিত হয়ে যায়। তখন আমার এমন অনুভূতি হয়, যেন অর্থের একটি পুঁটলি আমার হৃদয়ের ওপর বেঁধে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে।"

হজরত সাহেব বললেন, "আমাদের পবিত্র কোরআনের গভীর তত্ত্ব ও নিগূঢ় জ্ঞান দান করেই প্রেরণ করা হয়েছে এবং এর সেবাকেই আমাদের কর্তব্য হিসেবে নির্ধারিত করা হয়েছে। অতএব, আমাদের সান্নিধ্যের উপকারও এটাই হওয়া উচিত।"

এই অধম নিবেদন করছে যে, হাজি আবদুল মজিদ সাহেব লুধিয়ানভিও আমাকে বর্ণনা করেছেন, আমাদের পূর্ববর্তী পির মুনশি আহমদ জান সাহেব (মরহুম) একবার হজরত সাহেবের কাছে বাইআত গ্রহণের আবেদন করেছিলেন। কিন্তু হুজুর বলেছিলেন, لَسْتُ بِمَأْمُوْرٍ অর্থাৎ, "আমাকে এ বিষয়ে আদেশ দেওয়া হয়নি।"

এই অধম আরও নিবেদন করছে যে, হজরত খলিফাতুল মসীহ আউয়ালও যখন হুজুরের কাছে বাইআত গ্রহণের আবেদন করেছিলেন, তখন হুজুর একই উত্তর দিয়েছিলেন-"আমাকে এ বিষয়ে আদেশ দেওয়া হয়নি।" অতঃপর পরবর্তীকালে যখন আদেশ আসে, তখন হুজুর বাইআতের ব্যবস্থা শুরু করেন।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১১২) মিয়াঁ আবদুল্লাহ সাহেব সানৌরি আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার হজরত সাহেব বড় মসজিদে পায়চারি করছিলেন। আমি মসজিদের এক কোণে বসে পবিত্র কোরআন পাঠ করতে লাগলাম। তখন মসজিদে আর কোনো ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন না।

হুজুর পায়চারি করতে করতে একবার থেমে আমার দিকে তাকালেন। আমিও ঠিক সেই সময় তাঁর দিকে তাকিয়েছিলাম। যখন আমার ও হুজুরের দৃষ্টি মিলিত হলো, তখন জানি না, সেই মুহূর্তে হুজুরের দৃষ্টিতে কী ছিল যে, আমার বুকের ভেতর আমার হৃদয় যেন গলে গেল। আমি দোয়ার জন্য দুই হাত তুলে নিলাম এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে দোয়া করতে থাকলাম।

হুজুর পায়চারি করতে থাকলেন। অবশেষে হুজুরই আমাকে বললেন, "মিয়াঁ আবদুল্লাহ! অনেক দোয়া হয়েছে, এবার বন্ধ করো।"

মিয়াঁ আবদুল্লাহ সাহেব বলতেন, "সেদিন আমি বুঝতে পেরেছিলাম, এই যে বলা হয়-কোনো কোনো সময় একজন পূর্ণতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির একটিমাত্র দৃষ্টি মানুষকে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দেয়, এর অর্থ কী!

মিয়াঁ আবদুল্লাহ সাহেব আরও বলতেন, "যখনই হুজুরের ভালোবাসা ও স্নেহের কথা আমার মনে পড়ে, তখন আমার প্রাণ গলে যায়।"

সন্তানদের প্রতিপালন ও আহমদী মায়েদের দায়িত্বসমূহ

[ডা. মনসূরা ইলাহদ্দীন, কাদিয়ান]

[পূর্ববর্তী সংখ্যার পর]

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত

এভাবেই সন্তানদের তরবিয়তের আরেকটি দিক হলো পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত। এ ক্ষেত্রেও নিয়মানুবর্তিতা থাকা উচিত। প্রতিদিন সকালে প্রত্যেক আহমদী পরিবারের ঘর থেকে কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ ওঠা এবং শোনা যাওয়া উচিত। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে শুধু তিলাওয়াত করার নির্দেশই দেননি, বরং পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সময়ও বলে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

(সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত ৭৯)

নিশ্চয়ই ফজরের সময় কুরআন পাঠ এমন একটি বিষয়, যার সাক্ষ্য দেওয়া হয়।

হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) বলেন:আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যদি রক্ষা করতে হয়, তাহলে পবিত্র কুরআনই তাদের রক্ষা করবে। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং এর অর্থ নিয়ে চিন্তাভাবনা করা আমাদের সন্তানদের তরবিয়তের একটি মৌলিক প্রয়োজন এবং তরবিয়তের চাবিকাঠি। এমন কোনো শিশু থাকা উচিত নয়, যার তিলাওয়াত করার অভ্যাস নেই। তাকে বলা উচিত, তুমি প্রাতঃরাশ না হয় ছেড়ে দেবে, কিন্তু স্কুলে যাওয়ার আগে অবশ্যই তিলাওয়াত করবে। আর তিলাওয়াতের সময় কিছুটা অনুবাদও অবশ্যই পড়বে; শুধু তিলাওয়াত করবে না। (৭ জুলাই ১৯৯৭ তারিখে প্রদত্ত জুমার খুতবা)

হযরত খলিফাতুল মসীহ খামেস (আল্লাহ তাঁর সাহায্য করুন) বলেন:

"এভাবেই আমি আহমদী মায়েদের ও মেয়েদের আরও বলতে চাই যে, যখন আপনারা নামাজের প্রতি মনোযোগ দেবেন, তখন পবিত্র কুরআন পাঠ করা এবং তা বোঝার প্রতিও মনোযোগ দিন। এর মাধ্যমে আপনারা আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলি সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং এর ফলে নিজেদের সন্তানদের সঠিক তরবিয়ত করার পথও খুঁজে পাবেন। অতএব, পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করা এবং এর অনুবাদ পড়াও আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাবলি বোঝার জন্য অত্যন্ত জরুরি।" (বার্ষিক জলসা মরিশাস, ২০০৫; আল-আযহার, প্রথম খণ্ড, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫৪-৩৫৫)

অতএব, আমরা মায়েদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যে, আমরা নিজেরা নিয়মিত পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করব। এর অর্থ ও তাৎপর্য শিখব, বুঝব, এর ওপর আমল করব এবং নিজেদের সন্তানদেরও এর অভ্যাস গড়ে তুলতে শেখাব। আর আল্লাহরই সাহায্যে সাফল্য লাভ করা সম্ভব।

খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা

এভাবেই সন্তানদের তরবিয়তের ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো নিজেদের মধ্যে এবং নিজেদের সন্তানদের মধ্যে খিলাফতের প্রতি ভালোবাসার চেতনা সৃষ্টি করা। আজ পৃথিবীতে বসবাসকারী সমস্ত মানুষের মধ্যে একমাত্র জামাতে আহমদীয়া-ই এমন একটি জামাত, যা খিলাফতের ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে নিরাপত্তার দুর্গে অবস্থান করছে এবং এর বরকত ও কল্যাণধারা থেকে উপকৃত হচ্ছে। আমরা যদি চাই যে, এই বরকতগুলো বংশপরম্পরায় আমাদের মধ্যে অব্যাহত থাকুক, তাহলে আমাদের ওপর এই মহান দায়িত্ব বর্তায় যে, আমরা পূর্ণ আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে সময়ের খলিফার আনুগত্য করব এবং আমাদের ওঠাবসা, চলাফেরা, পোশাক-পরিচ্ছদ- আমাদের জীবনের সবকিছুই যেন সময়ের ইমামের নির্দেশনা অনুসারে হয়। খিলাফতের নৈকট্য লাভ করা এবং এর বরকত অর্জন করার এটাই উপায়।

এ জন্য প্রয়োজন, আমরা নিয়মিত হুযূর আনওয়ার (আল্লাহ তাঁর সাহায্য করুন)-এর সমস্ত খুতবা ও অনুষ্ঠান শুনব এবং নিয়মিত তাঁর খেদমতে দোয়ার চিঠি লিখব। নিজেদের সন্তানদের মধ্যেও এই অভ্যাস গড়ে তুলব এবং তাদের উপদেশ দেব, যেন তারা কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অবশ্যই নিজেদের প্রিয় সময়ের ইমামের কাছ থেকে দিকনির্দেশনা লাভ করে।

এ ছাড়া খলিফাতুল ওয়াক্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ হলে সেটিকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দেবে। সন্তানদের এমটিএর সঙ্গে সংযুক্ত রাখব এবং নিজেরাও তাদের সঙ্গে নিয়ে এর অনুষ্ঠানগুলো দেখব। নিজেদের মধ্যে এবং নিজেদের সন্তানদের মধ্যে বিশেষভাবে হুযূর আনওয়ার (আল্লাহ তাঁর সাহায্য করুন)-এর জন্য দোয়া করার অভ্যাস গড়ে তুলব। এর ফলে হুযূরের প্রতি বিশ্বস্ততা ও ভালোবাসার সম্পর্ক ক্রমেই আরও দৃঢ় হতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

খিলাফতের প্রতি ভালোবাসার প্রসঙ্গে ২০০৫ সালে বার্ষিক জলসা তানজানিয়ার একটি ভাষণে হুযূর আনওয়ার বলেন:

"উগান্ডায়ও যখন আমরা অবতরণ করলাম এবং গাড়ি থেকে বাইরে এলাম, তখন একজন নারী তাঁর শিশুকে কোলে নিয়ে-শিশুটির বয়স ছিল দুই থেকে আড়াই বছর-আমাদের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে চলছিলেন। তাঁর নিজের মধ্যেও পরিচিতির অনুভূতি ছিল। খিলাফত ও জামাতের সঙ্গে তাঁর একটি সম্পর্ক প্রকাশ পাচ্ছিল। বিশ্বস্ততার সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। কিন্তু শিশুটির আমার প্রতি মনোযোগ ছিল না। কিছুক্ষণ পরপর তিনি শিশুটির মুখ আমার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন, যেন বলছেন, 'দেখো!' তিনি অনেক দূর পর্যন্ত দৌড়ে গেলেন। এত ভিড় ছিল যে, তাঁকে ধাক্কাও খেতে হচ্ছিল, কিন্তু তিনি এদিকে কোনো পরোয়া করেননি। অবশেষে যখন শিশুটির দৃষ্টি আমার ওপর পড়ল, তখন সে আমাকে দেখে হাসল এবং হাত নাড়ল। তখন মায়ের মনে শান্তি এল। শিশুটির মুখের যে উজ্জ্বলতা ও হাসি ছিল, তাও এমন ছিল যেন সে আমাকে বহু বছর ধরে চেনে। সুতরাং, যত দিন এমন মায়েরা জন্ম নিতে থাকবেন, যাঁদের কোলে খিলাফতের প্রতি ভালোবাসাপূর্ণ শিশুরা বেড়ে উঠবে, তত দিন খিলাফতে আহমদীয়ার কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই।"

উন্নত নৈতিক চরিত্র

সন্তানদের তরবিয়তের ক্ষেত্রে মায়েদের আরেকটি দায়িত্ব হলো, নিজেদের সন্তানদের উন্নত নৈতিক চরিত্রে সুশোভিত করা। মিথ্যা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা উচিত; বরং মিথ্যার প্রতি ঘৃণা থাকা উচিত। শুধু মুখে উপদেশ দেওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং নিজেদেরও সত্য কথা বলার বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। খেলাধুলা ও হাসি-ঠাট্টার মধ্যেও কখনো মিথ্যা বলা উচিত নয়।

সন্তানদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের মর্যাদাবোধ থাকা উচিত। পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা, সদাচরণ, কোমল ও পবিত্র ভাষার ব্যবহার, ধৈর্য ও অল্পে সন্তুষ্ট থাকার মানসিকতা, উদারতা, দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি এবং তার দুঃখ-কষ্ট দূর করার অভ্যাস, বড়দের সম্মান, আনুগত্য ও বাধ্যতা-এই সমস্ত সদ্গুণ শৈশবেই প্রচেষ্টার মাধ্যমে গড়ে তোলা যায়। এগুলোর চর্চাও ঘর থেকেই শুরু হওয়া উচিত। কারণ, অনেক সময় মা-বাবারাই তাঁদের সন্তানদের নৈতিক চরিত্র নষ্ট করার কারণ হয়ে দাঁড়ান। অসদাচরণ অত্যন্ত বড় একটি পাপে পরিণত হয়, কারণ অসদাচারী মানুষের জন্য জান্নাতের ধারণা করা যায় না।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন:

"মা-বাবা তাঁদের সন্তানকে অসদাচরণের কুপ্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য যত প্রচেষ্টাই করুন না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত শিশুর সাহচর্য ও মেলামেশার পরিবেশ সৎ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সন্তানদের নৈতিক চরিত্র সংশোধন করার ক্ষেত্রে মা-বাবার প্রচেষ্টা কার্যকর ও উপকারী প্রমাণিত হতে পারে না। নিঃসন্দেহে, তাদের উত্তম তরবিয়তের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সন্তানদের মধ্যে সৎ চিন্তাভাবনা সৃষ্টি হয়। কিন্তু উত্তম তরবিয়তের পাশাপাশি যদি শিশুর সাহচর্যও ভালো না হয়, তাহলে অসৎ সাহচর্যের প্রভাব তরবিয়তের প্রভাবকে এতটাই দুর্বল করে দেয় যে, সেই তরবিয়ত হওয়া আর না হওয়া প্রায় সমান হয়ে দাঁড়ায়। শৈশবের অসৎ সাহচর্য শিশুর মধ্যে এমন সব অভ্যাস সৃষ্টি করে, যা পরবর্তী জীবনে দূর করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।"

(আল-আযহার, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬০-১৬১)

এ কারণে মা হিসেবে আমাদের কর্তব্য হলো, নিজেদের বাস্তব আদর্শ উপস্থাপন করার পাশাপাশি সন্তানদের ওপর নজর রাখব, তারা কোথাও খারাপ সঙ্গ গ্রহণ করছে কি না অথবা অসদাচরণমূলক কোনো অনুষ্ঠান দেখছে কি না।

হযরত খলিফাতুল মসীহ খামেস (আই.) বলেন:

"অতএব, আহমদী শিশুদের মায়েরা যদি নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকেন, আজ যদি আপনারা নিজেদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে থাকেন এবং আপনাদের কথা ও কাজের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য না থাকে, আপনাদের প্রতিটি কথা যদি সত্য এবং কেবল সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে ইনশাআল্লাহ, জামাতে আহমদীয়ার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনকারী প্রজন্ম হিসেবেই গড়ে উঠবে।

অতএব, সব সময় নিজেদের মনে নিজেদের এই মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত রাখুন এবং নিজেদের ইবাদত ও বাস্তব আদর্শের উচ্চতর মান অর্জনের চেষ্টা করতে থাকুন। পবিত্র কুরআনের যত নির্দেশ রয়েছে, সেগুলোর ওপর আমল করার চেষ্টা করতে থাকুন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের যেসব উন্নত নৈতিক গুণাবলির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন, সেগুলো অর্জনের চেষ্টা করুন। সর্বদা নিজেরা নেক আমল করার পাশাপাশি অন্যদেরও নেক আমলের উপদেশ দিতে থাকুন। মন্দ কাজ পরিত্যাগ করুন এবং এরপর নিজেদের পরিবেশে মন্দ কাজ প্রতিরোধ করুন। সমাজেও যেন মন্দ কাজ ছড়িয়ে না পড়ে, সেদিকে খেয়াল রাখুন। পরস্পরের সঙ্গে সদাচরণ করুন। নিজেদের মনোমালিন্য ও অসন্তোষ ভুলে যান। সাধারণত দেখা গেছে, নারীরা নিজেদের ক্ষোভ ও মনোমালিন্য দীর্ঘ সময় ধরে হৃদয়ে পুষে রাখেন। যদি আপনাদের অন্তরে বিদ্বেষ ও শত্রুতা লালিত হতে থাকে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা এমন হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন না। এ ধরনের হৃদয়ের ইবাদতের মানও তেমন হয় না, যেমনটি আল্লাহ তা'আলা প্রত্যাশা

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

তুমি বল, 'হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ্! তুমি যাহাকে চাহ রাজত্ব দান কর এবং যাহার নিকট হইতে চাহ রাজত্ব কাড়িয়া লও।

(আলে ইমরান:২৭)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa, Berhampur, Murshidabad

করেন।" (বার্ষিক জলসা অস্ট্রেলিয়া, ২০০৬; মহিলাদের উদ্দেশে ভাষণ; আল-ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ১২ জুন ২০১৫)

অতএব, আমার প্রিয় বোনেরা! আমাদের সবার উচিত নিজেদের দায়িত্ব উপলব্ধি করে প্রস্তুত হয়ে যাওয়া এবং নিজেদের সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য কাজে লাগিয়ে দোয়ার সঙ্গে সন্তানদের তরবিয়তের কাজে আত্মনিয়োগ করা।

আমাদের প্রিয় নেতা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) বলেন:

"আজ যদি আপনারা মা হয়ে থাকেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলা আজও আপনাদের এই সামর্থ্য দিয়েছেন যে, আপনারা নিজেদের চারপাশে, নিজেদের পরিবেশে আল্লাহর ভালোবাসার রং ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারেন। আর যদি আপনারা এখনো মা না হয়ে থাকেন, তাহলে আজই নিজেদের মধ্যে সেই পবিত্র পরিবর্তনগুলো সৃষ্টি করুন, যাতে মা হওয়ার আগেই আপনারা আল্লাহকে ভালোবাসেন-এমন মানুষে পরিণত হয়ে যান।

সেই ছোট ছোট মেয়েশিশু ও ছেলেশিশুরা, যারা আপনাদের কোলে বেড়ে ওঠে, আপনাদের হাতে খেলা করে, আপনাদের দুধ পান করে বড় হয় অথবা আপনাদের হাত থেকে দুধ পান করে বড় হয়-শৈশবের সেই প্রাথমিক সময়েই তাদের আল্লাহর ভালোবাসার ঘুমপাড়ানি গান শোনান। তাদের সঙ্গে আল্লাহর ভালোবাসা নিয়ে কথা বলুন। তাহলে পরবর্তী জীবনের সমস্ত ধাপ সহজ হয়ে যাবে।

...আপনারা নিজেরা পরিবর্তিত না হলে আপনাদের সন্তানদের পরিবর্তন সম্ভব নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের নিজস্ব সত্তা আল্লাহর নূরে পরিপূর্ণ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সন্তানদের বক্ষও আল্লাহর নূরে পরিপূর্ণ হতে পারবে না।

...দেখুন, আপনারা একটি নতুন শতাব্দীর সূচনালগ্নে দাঁড়িয়ে আছেন। এই শতাব্দীর সংস্কারক হিসেবে আপনাদের প্রস্তুত করা হয়েছে। জাতি হিসেবে আপনাদের খলিফা বলা হয়েছে। ভবিষ্যৎ সময়গুলোতে সন্তানদের তরবিয়তের প্রয়োজন পূরণ করতে হবে আপনাদেরই। এটাই সেই পদ্ধতি, যার মাধ্যমে আপনারা ভবিষ্যৎ সময়গুলোতে সন্তানদের সর্বোত্তম তরবিয়ত করতে পারবেন। আল্লাহ তা'আলা আপনাদের এ কাজ করার তৌফিক দান করুন।" (যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা মহিলাদের অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ, ২৭ জুলাই ১৯৯১)

পরিশেষে, আমার প্রিয় ইমাম হযরত খলিফাতুল মসীহ খামেসআইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আযীয-এর একটি উদ্ধৃতি পাঠ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। তিনি বলেন:

"অতএব, হে আহমদী মায়েরা! হে সেই সৌভাগ্যবতী মায়েরা, যাঁরা মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে সাড়া দিয়ে এই যুগের ইমামকে চিনেছেন, তাঁর আনুগত্যের জোয়াল নিজেদের কাঁধে গ্রহণ করেছেন, পৃথিবীর বিরোধিতা সহ্য করেছেন এবং এই অঙ্গীকার করেছেন যে, আমরা সর্বদা ধর্মকে পার্থিব বিষয়ের ওপর প্রাধান্য দেব-আপনারা নিজেদের আত্মসমালোচনা করুন এবং দেখুন, আপনারা কোথাও এই অঙ্গীকার থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন কি না।

ধর্মকে পার্থিব বিষয়ের ওপর প্রাধান্য দেওয়া কি কেবল আপনাদের নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েনি? আপনারা কি এই শিক্ষাকে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যেও প্রসারিত করছেন? আপনারা কি এই অঙ্গীকার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন? আপনাদের কোলে বেড়ে ওঠা সন্তানরা কি 'ইবাদুর রহমান' এবং সৎকর্মশীলদের দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হওয়ার অধিকারী?

আল্লাহ তা'আলা যে আমানত আমাদের হাতে অর্পণ করেছিলেন, সেই আমানতের যথাযথ যত্ন কি আমরা নিয়েছি? আল্লাহ তা'আলা আমাদের গর্ভ থেকে সেই সন্তানদের এ উদ্দেশ্যে জন্ম দিয়েছেন যে, আমরা তাদের মহানবী (সা.)-এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করে আল্লাহ তা'আলার দরবারে উপহার হিসেবে পেশ করতে পারব। আমরা কি তাদের যথাযথ তরবিয়ত করেছি? আমরা এবং আমাদের সন্তানরা কি 'খাইরে উম্মত' বা সর্বোত্তম জাতি হিসেবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য?

যদি এর উত্তর 'হ্যাঁ' হয়, তাহলে আপনাদের অভিনন্দন। আর যদি তা না হয়, তাহলে এই সমস্ত কিছু অর্জন করার জন্য আপনাদের নিজেদেরও সংশোধন করতে হবে। যেখানে প্রয়োজন, সেখানে নিজেদের স্বামীদেরও ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। নিজেদের ঘরের পরিবেশও এমন পবিত্র করে তুলতে হবে, যেখানে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক একটি সৎ ও পবিত্র পরিবেশের জন্ম দেবে। এভাবে প্রত্যেক আহমদী পরিবার একটি সৎ ও পবিত্র সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হয়ে উঠবে এবং সেই পরিবারে যে শিশুর জন্ম হবে, যে শিশু বেড়ে উঠবে, সে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

যুগ ইমামের বাণী

পরনিন্দা ও পরচর্চা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা উচিত।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড,পৃ: ৪০৭)

দোয়াপ্রার্থী: Mirza Naeema Begum & Family
Bithari, 24 PGS (N)

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর অস্ট্রেলিয়া সফর (২০১৩)

হুযুর আনোয়ার আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আযীয সকাল পাঁচটা বেজে চল্লিশ মিনিটে উপস্থিত হয়ে ফজরের নামাজ পড়ান। নামাজ আদায়ের পর হুযুর আনোয়ার তাঁর বাসভবনে ফিরে যান।

সকালে হুযুর আনোয়ার আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আযীয দাপ্তরিক ডাক, চিঠিপত্র ও প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করেন এবং বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেন। হুযুর আনোয়ার বিভিন্ন দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদনে ব্যস্ত থাকেন।

আজ কারবেন (Karben) শহরে 'মসজিদে সাদিক'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছিল।

হুযুর আনোয়ার আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আযীয চারটা পঞ্চাশ মিনিটে তাঁর বাসভবন থেকে বাইরে আসেন এবং ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে কারবেনের উদ্দেশে যাত্রা শুরু হয়। এখান থেকে কারবেন শহরের দূরত্ব ১৯ কিলোমিটার। সতেরো মিনিটের সফর শেষে পাঁচটা সাত মিনিটে হুযুর আনোয়ার আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আযীয 'মসজিদে সাদিক'-এ আসেন। এখানকার স্থানীয় জামাতের সদস্যরা অত্যন্ত উৎসাহ ও আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁদের প্রিয় নেতার অভ্যর্থনা জানান। তাঁদের জন্য আজকের দিনটি ছিল অপরিসীম আনন্দ ও বরকতের দিন। হুযুর আনোয়ার আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আযীযের মুবারক পদধূলি দ্বিতীয়বারের মতো তাঁদের আবাসভূমিতে পড়েছিল। এর আগে ১৭ জুন ২০১৪ সালে হুযুর আনোয়ার আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আযীয এখানে এসেছিলেন এবং মসজিদে সাদিকের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন।

আজ প্রত্যেকেই অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন। হুযুর আনোয়ার আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা যখনই গাড়ি থেকে বাইরে তাশরিফ আনেন, তখন জামাতের সদস্যরা আনন্দের সঙ্গে বিভিন্ন স্লোগান উচ্চারণ করেন এবং ছেলে ও মেয়েরা দলবদ্ধভাবে স্বাগতসূচক দোয়ামূলক কবিতা আবৃত্তি করে শোনায়। এ সময় কারবেন শহরের জামাত সভাপতি সম্মানিত আতিফ শাহজাদ ওয়ার্ক সাহেব, আঞ্চলিক আমীর মুজাফফর আহমদ ভাট্টি সাহেব এবং এখানকার মুরব্বি তহসিন রশীদ সাহেব হুযুর আনোয়ার আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলাকে স্বাগত জানান।

অতঃপর হুযুর আনোয়ার মসজিদের বাইরের দেওয়ালে স্থাপিত ফলকের আবরণ উন্মোচন করেন এবং দোয়া পরিচালনা করেন।

এরপর হুযুর আনোয়ার আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা মসজিদের নামাজের হলে আসেন এবং যোহর ও আসরের নামাজ একত্রে আদায় করান। এর মধ্য দিয়েই মসজিদটির উদ্বোধন সম্পন্ন হয়।

নামাজ আদায়ের পর হুযুর আনোয়ার জামাতের মোট সদস্যসংখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। স্থানীয় জামাত সভাপতি নিবেদন করেন যে, তাঁদের জামাতের মোট সদস্যসংখ্যা প্রায় ২৮০ জন।

হুযুর আনোয়ারের জিজ্ঞাসার উত্তরে যে, এখানকার লোকেরা কাজকর্মের জন্য কোথায় যান, সভাপতি সাহেব নিবেদন করেন যে, তাঁরা ফ্রাঙ্কফুর্টে যান এবং বর্তমানে অনেকেই নিজেদের বাড়ি থেকেও অনলাইনে কাজ করছেন।

অতঃপর হুযুর আনোয়ার এই শহরে নতুন আগত সদস্যদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। এ প্রসঙ্গে একজন যুবক জানান যে, তিনি আহমদ খান মঙ্গাল সাহেবের ছেলে এবং ২০১৮ সালে রাবওয়া থেকে এখানে এসেছেন।

রাবওয়া থেকে আগত একজন ছাত্র জানান যে, তিনি বর্তমানে এখানে কাজও করছেন এবং পাশাপাশি জার্মান ভাষার কোর্সও করছেন।

এরপর হুযুর আনোয়ার আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা মসজিদ-সংলগ্ন কমনরুম ও কার্যালয় পরিদর্শন করেন। এ সময় শিশুরা বাইরে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। হুযুর আনোয়ার স্নেহপরবশ হয়ে শিশুদের চকলেট উপহার দেন।

অতঃপর হুযুর আনোয়ার আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা মসজিদের সেই অংশে আসেন, যেখানে লাজনা সদস্যারা উপস্থিত ছিলেন। এখানে শিশুরা হুযুর আনোয়ারের খেদমতে দোয়ামূলক কবিতা আবৃত্তি করে শোনায়। মহিলারা হুযুরের দর্শন লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন। মহিলাদের সংখ্যা অধিক হওয়ায় বাইরে স্থাপিত তাঁবুতেও মহিলাদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। হুযুর আনোয়ার আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা মহিলাদের জন্য নির্ধারিত তাঁবুতেও এসে চকলেট উপহার দেন।

অতঃপর হুযুর আনোয়ার আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা মসজিদের বাইরের আঙিনায় একটি বাদামগাছের চারা রোপণ করেন।

এরপর জামাত কারবেনের মজলিসে আমেলার সদস্যবৃন্দ, 'একশত মসজিদ' বিভাগের কর্মী এবং মসজিদ নির্মাণকালে ওয়াকারে আমলকারী দলের সদস্যরা হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে দলবদ্ধভাবে ছবি তোলার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

মসজিদে সাদিকের উদ্বোধন উপলক্ষে মসজিদ থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
akhbaarbadarbanglaqdn@gmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026 -2028 Vol-11 Thursday, 12 Nov, 2026 Issue No.46

Act.
MANAGER
ATHAR AHMAD SHAMIM
Mob: +91 9815639670
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

৯ পাতার পর.....

অবস্থিত শহরের টাউন হলে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

হুযূর আনোয়ার আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে মসজিদ থেকে রওনা হয়ে পাঁচটা পঞ্চান্ন মিনিটে ওই হলে উপস্থিত হন। হুযূর আনোয়ারের আগমনের পূর্বেই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী অতিথিরা নিজ নিজ আসনে বসে গিয়েছিলেন। আজকের এই অনুষ্ঠানে ৯১ জন অতিথি অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল-সিডিইউ (CDU), এসপিডি (SPD), ডিগ্রুনেন (DIE GRÜNEN) ও এফডিপি (FDP)-এর স্থানীয় ও প্রাদেশিক পর্যায়ের রাজনীতিবিদ, ক্যাথলিক চার্চের প্রতিনিধি, প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চের প্রতিনিধি, মরমন কালচার রিজিয়নের প্রতিনিধি, পুলিশ বিভাগের সদস্য, দমকল বাহিনীর সদস্য, আইনজীবী, বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, স্পোর্টস ক্লাবের সদস্য এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অতিথিবৃন্দ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সম্মানিত হাফেয বদরিয়া সর আশরাফ সাহেব পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন এবং সম্মানিত ইয়াসির আহমদ সাহেব এর জার্মান ভাষায় অনুবাদ উপস্থাপন করেন।

এরপর সম্মানিত আমীরে জামাত জার্মানি তাঁর পরিচিতিমূলক বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

আমীরে জামাত এই শহরের পরিচিতি তুলে ধরে জানান যে, ১৯৭০ সালে কারবেন শহরের প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়। তবে এই শহরের শিকড় আরও সুপ্রাচীন। কারবেন শহরের নামের উল্লেখ সর্বপ্রথম ১৮২৭ সালে পাওয়া যায়।

এই শহরে ১৯৮৭ সাল থেকে আহমদিরা বসবাস করতে শুরু করেন। তবে ১৯৮৮ সালে জামাতের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথম দিকে ছয়টি পরিবার নিয়ে জামাতের সদস্যসংখ্যা ছিল ২৫ জন। বর্তমানে এই সংখ্যা বেড়ে ২৭৬ জনে পৌঁছেছে।

প্রথম দিকে বিভিন্ন বাড়িতে কেন্দ্র স্থাপন করে নামাজ আদায় করা হতো। পরবর্তীকালে নামাজ ও সভা-সমাবেশের জন্য একটি ছোট বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়, যা ২০১৩ সাল পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়েছে। এরপর শহরের টাউন হলের ভূগর্ভস্থ তলায় একটি জায়গা পাওয়া যায়। সেখানে জামাত নিজেদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করতে থাকে।

কারবেনে জামাতে আহমদীয়া মুসলিমা বহু বছর ধরে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের কারণে পরিচিত। ২০১৩ সাল থেকে আমাদের যুবকদের অঙ্গসংগঠন কারবেন শহরের আবর্জনা ও ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কারের অভিযানে অংশগ্রহণ করে আসছে। এভাবে নিয়মিতভাবে নববর্ষের উপলক্ষেও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

২০১৩ সালে মসজিদের জন্য জমি সংগ্রহের বিষয়ে আলোচনা শুরু হয় এবং ভবন নির্মাণের প্রাথমিক আবেদন অনুমোদিত হলে ২০১৪ সালে ৮৩৪ বর্গমিটার আয়তনের এই জমি লাভ করার সৌভাগ্য হয়। হুযূর আনোয়ার আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আযীয ১৭ জুন ২০১৪ সালে এখানে তাশরিফ এনে মসজিদে সাদিকের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

নামাজের হলের সঙ্গে একটি বহুমুখী কক্ষও নির্মাণ করা হয়েছে। এই দুটি স্থাপনার মোট নির্মাণ-আয়তন ১২৬ বর্গমিটার। এ ছাড়াও একটি কার্যালয় এবং আরও কয়েকটি ছোট কক্ষ রয়েছে, যেগুলো কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করা হবে। মসজিদ-সংলগ্ন একটি রান্নাঘর ও একটি অতিথিকক্ষও রয়েছে। গম্বুজটির ব্যাস ছয় মিটার। দুটি মিনার নির্মাণ করা হয়েছে, যার প্রত্যেকটির উচ্চতা সাত মিটার। এই মসজিদের নির্মাণকাজ ষাট লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ইউরো ব্যয়ে সম্পন্ন হয়েছে।

জার্মানির আমীরে জামাতের বক্তব্যের পর জার্মান সংসদের সদস্য নাতালি পাওলিক (Natalie Pawlik) সাহেবা তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, আমি মহামান্য হুযূরের খেদমতে সালাম নিবেদন করছি। একইভাবে জাতীয় আমীর আবদুল্লাহ ওয়াগিশাউজার সাহেব, মেয়র সাহেব এবং উপস্থিত সকল সম্মানিত অতিথিকেও সালাম জানাচ্ছি।

এরপর তিনি বলেন, সর্বপ্রথম আমি আপনাদের আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই। মসজিদে সাদিকের উদ্বোধন উপলক্ষে আপনাদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এই মসজিদ উদ্বোধনের মাধ্যমে জামাতে আহমদীয়া মুসলিমার সদস্যরা এখন এমন একটি স্থান লাভ করেছেন, যেখানে তাঁরা প্রশান্তি অনুভব করবেন এবং যেখানে আপনারা সকলে একত্রে নিজেদের ইবাদত-বন্দেগি সম্পাদন করতে পারবেন।

অতঃপর তিনি বলেন, ধর্মীয় স্বাধীনতা জার্মানির সংবিধানের একটি মৌলিক অংশ। কিন্তু আমরা যখন বিভিন্ন দেশের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন দেখতে পাই যে, সর্বত্র প্রত্যেক মানুষকে এই অধিকারগুলো একইভাবে প্রদান করা হয় না। মানুষকে তাদের ধর্মের কারণে নির্যাতন সহ্য করতে হয়। দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে, আহমদি মুসলমানদের ওপরও এ ধরনের নির্যাতন করা হয়। পাকিস্তান কিংবা বুরকিনা ফাসোর মতো অনেক দেশে আপনাদের প্রিয়জনদের ওপর অত্যাচার করা হয়। ধর্মের কারণে আপনাদের গ্রেপ্তার করা হয়, আপনাদের মসজিদ ও কবরস্থান ভেঙে ফেলা হয়। আপনাদের পক্ষে শান্তিতে বসবাস করা সম্ভব হয় না এবং আপনাদের জীবন সর্বদা বিপদের মুখে থাকে। আমার মতে, এ ধরনের ঘটনাগুলো ব্যাপকভাবে প্রচার করা অত্যন্ত জরুরি, যাতে বিশ্ববাসী এ সম্পর্কে জানতে পারে। এরপর সকল গণতন্ত্রকামী মানুষের কর্তব্য হলো আপনাদের পাশে দাঁড়ানো। সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা মূলত শান্তিরই একটি মাধ্যম। স্থায়ীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা তখনই সম্ভব, যখন আমরা প্রত্যেক মানুষের জন্য এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করব, যাতে তারা স্বাধীনভাবে এবং নির্যাতন থেকে সুরক্ষিত থেকে বসবাস করতে পারে।

তিনি বলেন, ধর্মের কারণে আমাদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়। এই অঞ্চলে আমাদের সকলের পারস্পরিক সম্প্রীতি ও মিলেমিশে বসবাসের বিষয়টি উল্লেখ করা আমি অত্যন্ত জরুরি মনে করি। আর এ কাজে জামাতে আহমদীয়া মুসলিমারও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

অতঃপর তিনি বলেন, কয়েক মাস আগে নিড্ডা (Nidda) শহরে জামাতে আহমদীয়া মুসলিমার সঙ্গে তাদের শতবার্ষিকী উদ্যাপনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ আমার হয়েছিল। কিন্তু আমাদের অনেক নাগরিকই জানেন না যে, এত দীর্ঘ সময় ধরে মুসলমানরা আমাদের মধ্যে বসবাস করছেন। সে সময় আমি নিজে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছিলাম যে, আপনাদের মূলমন্ত্র 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে' শুধু কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং আপনারা তা বাস্তবেও পালন করেন। আপনারা কিছুই গোপন করেন না এবং জার্মানিতে আপনারা সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন ও সকলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছেন। আপনাদের প্রতি আমার একান্ত কামনা এই যে, আপনারা মসজিদে সাদিকে আনন্দের সঙ্গে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবেন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ অব্যাহত রাখবেন। ধন্যবাদ।

অতঃপর প্রাদেশিক সংসদ সদস্য টোবিয়াস উটার (ঞড়নরধং টঃঃবৎ) সাহেব তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি সর্বপ্রথম হুযূর আনোয়ার আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আযীযকে সালাম জানান এবং স্বাগত বলেন। এরপর উপস্থিত সকলকেও স্বাগত জানান।

অতঃপর তিনি বলেন, জামাতে আহমদীয়া মুসলিমার একটি মসজিদ উদ্বোধন উপলক্ষে বক্তব্য রাখার এই বিশেষ সম্মান দ্বিতীয়বারের মতো লাভ করা আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। প্রাদেশিক সংসদ সদস্য হিসেবে আমি আপনাদের সকলের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এরপর তিনি বলেন, আজ জামাতে আহমদীয়া মুসলিমা কারবেনে একটি মসজিদ উদ্বোধনের সুযোগ লাভ করছে। এটি এ কথার প্রমাণ যে, জার্মানিতে প্রকৃতপক্ষেই প্রত্যেকের জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতা বিদ্যমান। বর্তমান সময়েও সর্বত্র প্রত্যেকের জন্য এ ধরনের সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান নেই। নিঃসন্দেহে আপনাদের এ বিষয়টিও শিখতে হয়েছে যে, জার্মানিতে নির্মাণকাজ-সংক্রান্ত আইনকানুন কতটা জটিল। কিন্তু আপনারা এখন মসজিদটির নির্মাণকাজ সম্পন্ন করেছেন। মসজিদ এমন একটি স্থান, যেখানে ইবাদত করা যায়; একই সঙ্গে এটি এমন একটি জায়গা, যেখানে মানুষ পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয় এবং যা শান্তিরও একটি কেন্দ্র।

প্রতিবারই আমার ভালো লাগে যখন দেখি যে, জামাতে আহমদীয়া শুধু নিজেদের জামাতের সদস্যদের নিয়েই চিন্তিত নয়; বরং আহমদি মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষায় সামগ্রিকভাবে মানবতার সেবা করার প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মহামান্য হুযূর সোমবার এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করেছেন যে, প্রতিবেশীর সেবা করা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে একটি কর্তব্য। আমি তো হেসে প্রদেশে আহমদিয়া সমাজের সদস্যদের অত্যন্ত সক্রিয় অবস্থায় দেখতে পাই।

যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফুযাত , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir